

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আউটডোর

এই গ্রন্থ শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়ে ওঠার বর্ণনা নয়। বরঞ্চ বিচ্ছুরিত শিল্পমাধুর্যের নৈকট্যে এক স্রষ্টার উপস্থিতির রোজনামচা। বিশ্বখ্যাত চিত্রপরিচালকের দৃষ্টির মধ্যেকার যে ইন্দ্রলোক তাকে ধরতে চেয়েছেন লেখক তাঁর কাব্যচেতনার কলাকৌশলে। সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' ছবিটিকে কেন্দ্র করে লখনউ শহরের প্রাচীন আর আধুনিক বিন্যাসকে পাশাপাশি রেখে তিনি চিনিয়েছেন শিল্পী-নির্মাতার একটি চিত্ররূপময় ধারাভাষ্য। কণ্ঠে নয় ভাষার ব্যঞ্জনায় প্রাচীনকে সঙ্গী করে আধুনিকতার মাঝখানেতঅন্বেষণ কত গভীর হতে পারে! সত্যজিতের প্রসারিত ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কথা বলেছেন লেখক। কোথাও অপরিহার্য মনে হয় চলচ্চিত্রকারের নিখুঁত বাস্তববোধ। অতীতের নিমগ্ন অবগাহনই শুধু নয় বর্তমানের পরিকাঠামোয় তার চিত্রণ, বিন্যাসের এক সুকৌশলী মহৎ শিল্পকর্ম। লেখকের পরিমার্জিত গদ্যভাষা বিবরণধর্মী না হয়ে, হয়ে উঠেছে সুষমামণ্ডিত কাব্যবলয়। যার সৌকর্য পাঠকের অনুভূতিমালায় ধরা পড়বে।

আ উ ট ডো র

আউটডোর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বর্ণপরিচয়

Outdoor
by Nirendranath Chakravarti

প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১০

বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর
পক্ষে ৪/১এ, নাসিরুদ্দিন রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭
থেকে সমর নাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস
১১৪এন, ডা. এস সি ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১০
থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সুব্রত মাজী
প্রচ্ছদ এবং ভিতরের আলোকচিত্র সন্দীপ রায়

একশো টাকা

উৎসর্গ

সন্দীপ রায়কে

লখনউয়ের দিনগুলির স্মরণে

ভূমিকা

যেমন সাহিত্য তেমন চলচ্চিত্র, দুটোই শিল্প। অথচ তাদের নির্মাণ তো একইভাবে হয় না, দুটো দুভাবে তৈরি হয়ে ওঠে। গল্প কিংবা উপন্যাস লেখা হয় আদ্যন্ত একটানা, সেখানে পরের অংশ আগে লিখলুম আর আগের অংশ পরে, এমনটা হবার উপায় নেই, বড়ো একটা হয়ও না। চলচ্চিত্রে কিন্তু সেটাই হয়। সেখানে যখন যে-অংশ তৈরি করার সুবিধে তখন সেটুকু তৈরি করে তারপর সর্বশেষে টুকরো-টুকরো অংশগুলিকে পরপর ধারাবাহিক সাজিয়ে নিয়ে গড়ে তোলা হয় সম্পূর্ণ একটি চলচ্চিত্র।

এ বড়ো কঠিন কাজ। দেখার ইচ্ছা ছিল যে, সত্যজিৎ রায়, যিনি নিজে একজন দক্ষ সফল সাহিত্যিক, আবার একইসঙ্গে বিশ্বমান্য একজন চলচ্চিত্রকার, সেই মানুষটি এ-কাজ কীভাবে করেন। ইচ্ছাপূরণ হতে দেরি হয় না। তিনি তখন প্রেম চন্দের 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'-র কাজ করছিলেন। তাঁকে আমার কথা জানাতে বলেন, 'বেশ তো, ছবির আউটডোরের একটা খুব জরুরি অংশের কাজ করতে আমরা শিগগিরই লখনউ যাচ্ছি, সেখানে চলে আসুন।'

আমার লখনউ যাবার ব্যবস্থা করে দেন 'আনন্দবাজার' কর্তৃপক্ষ। এ হল ১৯৭৭-এর জানুয়ারি মাসের কথা। ফিরে এসে 'আউটডোর' লিখি। সে-লেখা সেই বছরের 'দেশ' পত্রিকায় ৭মে থেকে ৯জুলাই ধারাবাহিক বার হয়। এখন বই হিসাবে বার হল।

ধন্যবাদ 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশনার শ্রীসমর নাগকে। ধন্যবাদ 'আনন্দবাজার' গ্রন্থাগারের শ্রীশক্তিপদ রায় ও শ্রীসুনীল দাশকে। ধন্যবাদ শ্রীতপন ঘোষকে। এঁদের আন্তরিক সাহায্য ছাড়া এ-বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা শক্ত হত।

সর্বশেষে যাঁর কথা না-বললেই নয়, তিনি শ্রীসন্দীপ রায়। 'আউটডোর'-এর ছবিগুলি তো তিনি দিয়েছেনই, উপরন্তু লখনউয়ের দিনগুলিতে যে সহৃদয় সাহায্য তাঁর কাছে পেয়েছি, তার কথা কখনও ভোলা যাবে না।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
জানুয়ারি ২০১০

লখনউয়ের ভদ্রতা, শালীনতা ও সহবতের কথা কে না জানে। আমরা যাকে 'নবাবি সৌজন্য' বলে জানি, এবং নিতান্ত গুটিকয় খানদানি পরিবারের মধ্যে আটকে না থেকে লখনউ-নগরের সামগ্রিক জনজীবনেও যার শিকড় একদা দ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিল, 'গুজিশ্‌তা লখনউ'-এর লেখক আবদুল হালিম 'শরর' তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, গত শতকের লখনউ এ-দেশে 'ভদ্রতা ও শিষ্টতার কেন্দ্র' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেইসঙ্গে লখনউবাসীদের 'দোস্ত্‌পরওঅরি' বা বন্ধুপ্রীতির উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেননি।

কিন্তু চিকনের-কাজ-করা সেই ভদ্রতা ও বন্ধুপ্রীতি আজ দমকা হাওয়ায় উড়ে গেছে। খসে পড়েছে সৌজন্যের মুখোশ। দাবার ছকের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মুখোমুখি যাঁরা বসেছিলেন, এবং বিনারক্তপাতে যুদ্ধজয়ের কৌশল উদ্‌ভাবন করে যাচ্ছিলেন, তাঁদের একজনের নাম মির্জা সাজ্জাদ আলি। অন্যজনের নাম মির রওশন আলি। দুজনেই জায়গিরদার; সম্পন্ন অভিজাত বংশের সন্তান। উপরন্তু তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তাঁদের মুখ দেখে সে-কথা এখন বোঝা যাবে না। মির্জা এসে মিরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এবং—দেওরাইকালানের শান্ত পরিবেশকে চমকে দিয়ে—মিরের হাতে ঝলসে উঠেছে একটি অস্ত্র। পোশাকে-আশাকে দুজনেই অতিশয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত, কিন্তু সেই জরিদার পোশাক এখন কারও নজরে পড়ে না। সবাই দেখতে পান, দুজনের চোখেই এখন হিংসার আগুন গনগন করে জ্বলছে।

ক্যামেরার পিছনে বসে, কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ চোখে এই দৃশ্য যিনি দেখে যাচ্ছেন, তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়। হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, ‘‘কাট! ফাইন।’’

টেনশনের বাঁধন মুহূর্তে শিথিল হয়ে যায়। পরিবেশের সেই রুদ্ধনিশ্বাস ভাবটা আর থাকে না। মনে হয়, ধনুকের ছিলাটাকে কেউ টান্-টান্ করে টেনে ধরেছিল, এখন আবার ছেড়ে দিয়েছে। মির্জা তাঁর আপন জায়গায় ফিরে গিয়ে, আলবোলার পেচ্ওয়ানটিকে সরিয়ে রেখে, নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরান। মিরও তাঁর হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে হাসতে থাকেন।

‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’-র দশ নম্বর সিকোয়েন্সের দৃশ্যে দুশো একষট্টি নম্বর শট্ নেওয়া হল।

কিন্তু, মির্জা ও মির যতই হাসুন, আবহমণ্ডলে এখনও হার্দ্য উষ্ণতার ছোঁয়া লাগেনি। পায়ে মোজা, পরনে গরম কোট-প্যান্টালুন, গলায় মাফলার। কিন্তু, হায় পশমের বর্মে আপাদমস্তক আবৃত হয়েও আমি ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছি। উত্তর-ভারতের একটা মস্ত এলাকা জুড়ে চলছে কোল্ড ওয়েভের দাপট। কেমন দাপট, ভোরবেলাতেই তার ইঙ্গিত পেয়েছিলুম। হোটেলের ঘরে বসে, কাগজের উপরে চটপট চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছিলুম যে, কালকের সর্বনিম্ন তাপাঙ্ক ছিল তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আজ কি আরও নামবে? নয়তো এই দুপুর-একটাতেও হাড়ে কাঁপুনি লাগছে কেন?

অন্যদের কিন্তু খুব-একটা-কিছু শীতার্ত বলে মনে হয় না। তার একটা কারণ নিশ্চয় এই যে, আমার কাজ যেক্ষেত্রে শুধুই দেখে যাওয়া, অন্যেরা সেক্ষেত্রে স্থির হয়ে কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

প্যারিস থেকে এসেছেন রঘুবীর সিং। ডাকসাইটে ফোটোগ্রাফার। ‘গঙ্গা’ ও ‘কলকাতা’-র পর এক-ডাকে সবাই যাঁকে চেনে, গলায় চার-চারটে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দারুণ ব্যস্ত তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিমাই ঘোষের দম ফেলবার ফুরসত নেই। সন্দীপ পটাপট স্টিল তুলছে।

জাভেদ সিদ্দিকি তাঁর খাতা হাতে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, 'শট্' সাঙ্গ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সামনে এগিয়ে এসেছেন তিনি, এবং সঞ্জীব ও সয়িদকে তাঁদের পরবর্তী সংলাপ বুঝিয়ে বলবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপাতত তিনি সয়িদকে নিয়ে ব্যস্ত। সেই অবসরে সঞ্জীবের গোঁফটিকে আঠা দিয়ে আরও ভালো করে সেঁটে দিচ্ছেন অনন্ত দাশ। শামা জায়দি এতক্ষণ সুরেশ জিন্দলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা শেষ করেই 'রোটি-কাবাব' আনবার জন্যে গাড়ি নিয়ে তিনি লখনউ ছুটলেন। দেওরাইকালান গ্রাম থেকে লখনউ ঠিক কত দূরে? ভানু ঘোষকে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, "মাইল পনেরো তো হবেই।" বলেই চেঁচাতে লাগলেন, "মাইজিলোগ্, উধার হটিয়ে, উধার হটিয়ে!!" দড়ি ডিঙিয়ে যাঁরা সামনে এগিয়ে এসেছিল, ভানু ঘোষ, কামু মুখোপাধ্যায় ও অনিল চৌধুরি এখন আবার তাদের পিছু হটিয়ে দিচ্ছেন। সৌম্যেন্দু রায় বলে দিচ্ছেন, রিফ্রেকটরগুলিকে এবার ঠিক কোথায়-কোথায় সরিয়ে নিতে হবে। শান্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর ক্ল্যাপস্টিকের গায়ে লিখে নিচ্ছেন পরবর্তী শটের নম্বর। কলকাতা থেকে আজ সকালেই এসে পৌঁছেছেন অ্যাসিসট্যান্ট পুলিশ কমিশনার সমীরকুমার সরকার। তিনি বোঝাচ্ছেন, উনিশ শতকের মধ্যভাগে কী কী অস্ত্র ব্যবহৃত হত।

আমার কাউকে কিছু বোঝাবার নেই। কিছু করবার নেই। আমি জানি না, মিড-শট ও লং-শটের মধ্যবর্তী দূরত্ব ঠিক কতখানি। কিংবা প্যান আর জুম কাকে বলে। আমার একমাত্র কাজ চোখ খুলে সব দেখে যাওয়া। উঠোনের এক কোণে একটি ডুমুর গাছ। সেই ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, পছিয়া বাতাসে কাঁপতে-কাঁপতে, আমি সব দেখে যাচ্ছি। সবচাইতে বেশি করে দেখছি দীর্ঘকায় সেই মানুষটিকে, এইমাত্র যিনি আবার ক্যামেরার পিছনে গিয়ে বসলেন।

আসলে সত্যজিৎ রায়কে দেখব বলেই আমি লখনউয়ে এসেছি। কলকাতায় কি দেখা যেত না? মজা এই যে, যদিও তিনি কলকাতার মানুষ, তবু সেখানে এত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে দেখবার সুযোগ আমার ঘটেনি। কলকাতায় তিনি অনেকজনের দ্বারা পরিবৃত থাকেন। ব্যূহ

ভেদ করে সেখানে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না। বোঝা যায় না, টুকরো-টুকরো কথা, সুর, আলো আর ছায়াকে কীভাবে তিনি একসূত্রে গেঁথে নেন। বোঝা যায় না, অজস্র অংশকে জোড়া লাগিয়ে কীভাবে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর শিল্প। বুঝবার জন্যে তাঁর কাছে যাওয়া দরকার। কাছে থাকা দরকার।

কলকাতায় তার সুযোগ নেই। সেই কারণে, আজ থেকে বছরখানেক আগে, সত্যজিৎকে বলি, আউটডোরের কাজ করতে তো মাঝে-মধ্যে তাঁকে বাইরে যেতেই হয়, পরেরবারে আমি তাঁর সঙ্গে যাব। ''আপনার এতে আপত্তি হবে?''

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন সত্যজিৎ। বলেছিলেন, ''আপত্তি কীসের? 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' যদি করি তাহলে লখনউয়ে তো যাবই। সেই সময়ে আপনিও চলুন না।''

কথাটা পাকা হয় গত ডিসেম্বরের শেষে। শুটিংয়ের একটা পর্ব কলকাতায় সমাপ্ত হবার পরে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সত্যজিৎ তখন বলেন, ''দিল্লির ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে কলকাতায় ফিরে জানুয়ারির থার্ড উইকে আমরা লখনউ যাচ্ছি। সেখানকার শুটিং চব্বিশ তারিখে শুরু হবে। আপনি বরং তেইশ তারিখেই চলে আসুন।''

২৩ জানুয়ারি। প্লেন ঠিক সাড়ে বারোটায় আকাশে উঠল। কিন্তু আই-এ-সির এই বোয়িং বিমান এক লম্ফে লখনউ যাবে না। মধ্যপথে দুবার মাটি ছোঁবে। রাঁচিতে আর পাটনায়, জানালার পাশে আসন পেয়েছি। তাই নামা-ওঠার ফাঁকে-ফাঁকে চেনা দুটি শহরের উপরে ফের একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারি। রাঁচিতে নামবার আগে পাহাড়চূড়ার সাদা বাড়িটা চোখে পড়ে। পাটনায় নামবার আগে দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্য। কলকাতায় কেন এই ধরনের কোনো ভাস্কর্য নেই? মন খারাপ হয়ে যায়। তারপরেই ফিরে আসি উনিশ শতকের লখনউয়ে। নতুন করে আবার 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র মধ্যে ডুব দিই।

কিন্তু প্রেম চন্দের এই কাহিনির মধ্যেই কি বেদনার উপাদান কিছু কম? আমি না-জানি উর্দু, না-জানি হিন্দি। সত্যজিতের কাছ থেকে তাই ইংরেজি তর্জমা সংগ্রহ করেছিলুম।



তর্জমায়, কে না জানে, মধ্যপথেই অনেক কিছু খোয়া যায়। যেমন স্থানান্তর, তেমনি ভাষান্তরেও বিভ্রাট ঘটে পদে-পদে। কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ে মাল পাঠালুম, কিন্তু ওয়াগান-ব্রেকারদের দৌরাত্ম্যে তার অর্ধেকটাই হয়তো মধ্যপথে গায়েব হয়ে গেল। এও সেই লস্ট ইন ট্রানজিটের ব্যাপার। মূলে যা ছিল ষড়ৈশ্বর্যময়, অন্য ভাষায় তার সবটা গিয়ে পৌঁছয় না। এখানেও নিশ্চয় মূলের সবটা ইংরেজিতে এসে পৌঁছয়নি। তা না-ই আসুক, উনিশ শতকের ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সেই গোধূলিবেলার বেদনা কিন্তু তর্জমাতেও ঠিকই ধরা পড়েছে।

অথচ, বিস্ময়ের ব্যাপার, তখনকার লখনউয়ের জীবনবিন্যাসে সেই বেদনার কোনো আভাসই ছিল না। ‘দুই নগরের কাহিনী’-র কথা মনে পড়ে যায়। ডিকেন্স সেখানে, সামান্য দু-চার কথায়, ফরাসি বিপ্লবের প্রাকমুহূর্তের বড়ো নিখুঁত একটি বর্ণনা দিয়েছেন। প্রেম চন্দও তাঁর এই কাহিনির সূচনায় এঁকেছেন সময়ের ছবি। সিপাহি মহাবিদ্রোহের আগুন তখনও জ্বলে ওঠেনি, কিন্তু তার পটভূমি ধীরে-ধীরে তৈরি হয়ে উঠছে। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তখনও সিংহাসন হারাননি। কিন্তু, ক্ষমতার আসন থেকে হঠাৎ-ধাক্কায় তাঁকে সরিয়ে দেবার জন্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে চক্রান্তজাল। উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইংরেজ সেনা। এইবারে তারা মঞ্চে এসে ঢুকবে। রাষ্ট্রীয় পট-পরিবর্তনের মুহূর্ত এবার আসন্ন।

কেমন ছিল সেই সময়? প্রেম চন্দ বলেছেন, লখনউয়ে তখন ফুর্তির জোয়ার বইছিল, এবং ছেলেবুড়ো ধনী দরিদ্র—সবাই গা ঢেলে দিয়েছিল তার তরঙ্গে। কেউ বসাচ্ছিল নাচের মজলিশ; কেউ বা বুঁদ হয়েছিল আফিঙের মৌতাতে; প্রশাসন, শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য আর সামাজিক আচরণে তখন আলস্য বিলাসের অন্ত ছিল না। আমোদ-আহ্লাদের জোয়ারে সবাই ভেসে চলেছে, কিন্তু সূর্য যে ওদিকে অস্তগামী, সেই খেয়াল কারও নেই।

বিস্ময়ের ব্যাপার? নাকি এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা? সূর্য তো আমাদের দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তেই গোটা আকাশকে—ক্ষণকালের জন্যে

হলেও—সবচেয়ে বর্ণাঢ্য পোশাকে সাজিয়ে দিয়ে যায়। ১৮৫৬ সালের লখনউয়ের সেই বর্ণবৈভব দেখে তাহলে অবাক হব কেন? তখনকার মানুষরা জানুক আর না-ই জানুক, ইতিহাসের অত্যন্ত অমনোযোগী ছাত্রও জানেন যে, অযোধ্যার রাজনৈতিক সূর্য তখন পাটে বসেছে, এবং চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে রাজধানীর আকাশে ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত রং।

লখনউয়ের মানুষরা যে সে-কথা আদৌ জানত না, তাও হয়তো নয়। শরর-এর ইতিবৃত্ত-বর্ণন থেকে তো বটেই, প্রেম চন্দের এই কাহিনি পড়তে-পড়তেও আমরা তার আভাস পাই। থেকে-থেকেই একটা সন্দেহ আমাদের মনের মধ্যে এসে উঁকি মারতে থাকে। আমাদের মনে হয়, ইতিহাস যে কোন্ পথে মোড় নিতে চলেছে, তা তারা জানত। কিন্তু ঘটনার স্রোতকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে যে উদ্যোগের দরকার হয়, তা তাদের ছিল না। কেনই বা থাকবে? স্বয়ং নবাব যেখানে রাজকার্যে উদাসীন এবং সংগীত কাব্য নৃত্য ও রমণীর চর্চায় আত্মহারা, প্রজাপুঞ্জের উদ্যমও সেখানে যদি রং-তামাশাতেই ফতুর হয়ে যায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ওয়াজিদ আলি শাহ্ গুণী মানুষ ছিলেন অবশ্যই, কিন্তু যেমন চারুকলার অনুশীলনে তেমনি বিলাসব্যসনে তাঁর আসক্তি ছিল অত্যধিক, ফলত ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষের ঝুঁকি তিনি নেননি। ভারত-ইতিহাসের সেই সন্ধিলগ্নে তাঁর প্রজাপুঞ্জও তাই নির্বিকার থেকেছে।

যদি বলি যে, 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র মির্জা ও মির আসলে ব্যতিক্রম নয়, বরং সার্বিক এই নিশ্চেতনারই প্রতীক দুটি চরিত্র, তাহলে কি ভুল বলা হবে? নিজেকে এই প্রশ্ন করি। কিন্তু উত্তর পাবার আগেই বিমান-সেবিকার নির্দেশ আসে, সিট-বেলট বাঁধুন এবং সিগারেট নিবিয়ে ফেলুন, একটু বাদেই আমরা লখনউয়ে নামব।

প্লেন যখন বিমানবন্দরে নামে, ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটে। কিন্তু শহর এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তাই হোটেলে পৌঁছতে পাঁচটা বেজে যায়।

চেক ইন করে রিসেপশানের যুবকটিকে জিজ্ঞেস করি, ‘‘সত্যজিৎ রায় তো এই হোটেলেই আছেন, তাই না?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘এখন তাঁকে পাওয়া যাবে?’’

‘‘না। একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরবেন।’’

ঘরের চাবি নিই। লিফটে ঢুকে, বোতাম টিপে, সাত তলায় উঠে আসি। এই একঘণ্টা কী করব?

ঘরের একদিকে দেয়াল জুড়ে কাচ লাগানো। তার উপরে পর্দা ঝুলছে, পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাই। নীচে স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামে খেলা চলছে। কারা খেলছে? খানিক বাদেই সেটা বুঝতে পারি এবং অবাক হয়ে যাই।

২

ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বার্তাজীবীরা, সেক্ষেত্রে, যেখানেই যাক, প্রথমেই সেখানকার খবরের কাগজ দেখতে চায়। এটা তাদের অভ্যাসের ব্যাপার। লখনউ এয়ারেপোর্টে নেমে আমিও সেই অভ্যাসেরবশে সেদিনকার ন্যাশনাল হেরাল্ডের স্থানীয় এডিশনের উপরে চটপট একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলুম। আসলে, খবরে আমার ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা তার বিন্যাসে। হেডলাইনগুলোকে দ্রুত দেখে যাই। তারপরেই, যাঁর কাগজ তাঁকে ফেরত দিয়ে, এয়ারপোর্টের বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসি। গাড়িতে উঠি। গাড়ির জানালায় চোখ রাখতেই চোখ জুড়িয়ে যায়। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ।

বিমান বন্দরের চৌহদ্দির মধ্যেই এখানে দিব্যি চাষবাস চলছে। গম, কড়াইশুঁটি আর অড়হরের খেতে আলোছায়ার খেলা জমেছে। বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে হলুদ সর্ষে ফুল। ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে ডালপালা-ছড়ানো মস্ত মস্ত আম গাছ। জমি তো সরকারের। এসব গাছের আম তাহলে কারা খায়? এসব খেতের ফসলই বা কারা তোলে? ভাবতে ভাবতে বাইরের রাস্তায় এসে পড়ি। কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। রাস্তার দুদিকে মাঝেমধ্যে মোষের খাটাল আর ভাঙাচোরা বাড়ি। এখানে-ওখানে খাটিয়া পাতা। রাস্তায় টাঙ্গা চলছে। টাঙ্গাগুলোকে ভড়কে দিয়ে কখনো-সখনো হুশ করে একটা মালবোঝাই ট্রাক কিংবা যাত্রীবোঝাই বাস বেরিয়ে যায়। মফস্‌সল-মফস্‌সল ভাবটা খুব স্পষ্ট। খানিকবাদে একটা

নহর পেরোই। লক্ষ করি, এই শীতেও সে শুকোয়নি, জলের প্রাচুর্যে ঢলঢল করছে তার সর্বাঙ্গ। বসতি ক্রমে ঘন হয়। রাস্তার ধারের একটা দোকানের সাইনবোর্ড পড়ে জানতে পারি যে, জায়গাটার নাম আলমবাগ। লখনউয়ের শহুরে চেহারা ক্রমে প্রকট হয়ে ওঠে।

আলমবাগের পরে চারবাগ। বাঁয়ে বাসের আড্ডা, ডাইনে রেলস্টেশন।

লখনউ রেলস্টেশনের চেহারা যে খুব সুন্দর, এটা কোনো নতুন খবর নয়। ড্রাইভার কিন্তু সেই পুরোনো খবরটাকেই আবার নতুন করে শুনিয়ে দেয়। বলে, "এমন খাপসুরত স্টেশন এদেশে আর একটিও নেই।"

আমি বলি, "স্টেশনের ওই গম্বুজগুলোর প্রশংসা আমি আগেই শুনেছি।"

"কোথায়?"

"বাদশাহী আংটিতে। তোপসের মুখে।"

এরপরে আর কথা আদৌ এগোয় না। গাড়ি না থামিয়েই মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভার একবার খুব বিভ্রান্তভাবে আমাকে দেখে নিয়ে তারপর বিলকুল বোবা হয়ে যায়। সম্ভবত ভাবে, তোপসে আবার কে রে বাবা, লোকটা শেষপর্যন্ত ভাড়ার কড়ি মিটিয়ে দেবে তো? আমি দেখি, চারপাশের রাস্তাঘাট বাড়িঘর হঠাৎ খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে। গোটা শহরের উপরে খেলা করছে বিকেলবেলার নরম রোদ্দুর। সেই রোদ্দুরে সবকিছুকে যেন দ্বিগুণ সুন্দর দেখায়। বিধানসভা থেকে খানিক এগিয়ে জমজমাট দোকানপাট। জামাকাপড় থেকে চানা-মশালা, হরেকরকমের দোকান। একটা সিনেমা হলও চোখে পড়ল। ফেলুদা বলেছিল, হজরতগঞ্জ হচ্ছে লখনউয়ের চৌরঙ্গি। ঠিক বলেছিল। রাস্তাঘাটের বিন্যাস অবশ্য একটু অন্যরকম। সেদিক থেকে দেখলে বরং মনে হবে, দিল্লির কনট সার্কাস এলাকার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিহি রকমের মিল রয়েছে।

এটাই হচ্ছে লখনউয়ের সবচেয়ে শৌখিন আর পরিচ্ছন্ন বাজার এলাকা। সত্যজিতের 'বাদশাহী আংটি'-তে তো বটেই, উর্মিলা হাকসারের আত্মজীবনীতেও এর বর্ণনা পড়েছি।

কিন্তু দেখতে যতই চকচকে হোক, মহল্লাটা নতুন নয়। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের বাবা নবাব আমজাদ আলি শাহই হজরতগঞ্জের পত্তন করে এখানে বাজার বসিয়ে গিয়েছিলেন। আবদুল হালিম শরর-এর সাক্ষ্য যদি সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, গত শতকেও হজরতগঞ্জ ছিল এই শহরের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর এলাকা, এবং এখানেই ছিল ধনী বণিকদের বড়ো বাজার। তারপরে অবশ্য হজরতগঞ্জের চেহারা অনেক পালটেছে। রাস্তা চওড়া হয়েছে। পুরোনো বাড়িগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। গড়া হয়েছে নতুন বাড়িঘর। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, হজরতগঞ্জের ভিতরে এখন আর পুরোনো লখনউয়ের মুখের আদল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পুরোনো সেই মেজাজকেও না। তা যদি যেত, আমাদের গাড়িটিকে ওভারটেক করে সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে পিছনের গাড়িটি কি তাহলে অত ছটফট করত, এবং পথচারীদের কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে মুহুর্মুহু অমন অভদ্রের মতন হর্ন বাজাত? মোটেই না। বরং আমরা তাকে পথ ছেড়ে দিলেও সে নিশ্চয় পিছনে-পিছনেই আসত। চাই কী, গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে পিছনের গাড়ির আরোহীকে যদি আমরা বলতুম, "পহলে আপ তশরীফ লে চলে" তাহলে তিনিও নিশ্চয় তাঁর গাড়ি থেকে নেমে, মাথাটাকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে, এবং দক্ষিণ করতলকে বুকের কাছে স্থাপন করে, অতি বিনম্রভাবে বলতেন, "জনাব আগে তশরীফ লে চলে; ম্যায় কিস কাবিল হুঁ।"

কিন্তু হায়, তেহি নো দিবসা গতাঃ, সেই নবাবও নেই, সেই লখনউও নেই। লখনউয়ের সেই নবাবি সৌজন্য এখন—অন্তত এই হজরতগঞ্জ এলাকায়—বিগত দিবসের স্মৃতিমাত্র। পিছনের গাড়িটি তাই, ডাইনে রাস্তা না পেয়ে, বাঁদিক দিয়েই অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে আমাদের ওভারটেক করে, এবং পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তার ড্রাইভার আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে অতিশয় রুক্ষ গলায় যা বলে যায়, উর্দুতে দখল না থাকা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারি যে, তার অর্থ হচ্ছে, ওরে উল্লুক, তুই কি গোরুর গাড়ি চালাচ্ছিস?

গাল খেয়ে আমাদের ড্রাইভারের মেজাজ মুহূর্তে বিগড়ে যায়, এবং পথের লোকজন, গাড়িঘোড়া ও ট্রাফিক পুলিশের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সেও বস্তুত উন্মাদের মতো গাড়ি চালাতে থাকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমি ভাবি যে, না, পুরোনো লখনউকে এখানে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

কোথায় পাওয়া যাবে? কলকাতার এক বন্ধু বলেছিলেন, চৌক এলাকায় পেতে পারো। কিন্তু আজ কি সেখানে যাওয়া যাবে?

হয়তো যেত। কিন্তু ক্লার্ক হোটেলের সাত তলার জানালায় দাঁড়িয়ে আর চৌকের কথা আমার মনে পড়ে না। তার বদলে, স্টেডিয়ামের দিকে তাকিয়ে, ন্যাশনাল হেরাল্ডের খেলার পাতায় চকিতে দেখে নেওয়া একটা হেডলাইনের কথা মনে পড়ে যায়। এবং তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারি যে, আসলে ওখানে নিখিল ভারত ইনভিটেশন হকির চূড়ান্ত খেলা চলছে।

কপাল আর কাকে বলে। এয়ারপোর্টে যখন কাগজ পড়ি, তখন মনে হয়েছিল, আহা, আজকের বদলে খেলাটা যদি আগামীকাল হত, তাহলে নিশ্চয় একটা টিকিট কেনবার জন্য লাইন দিতুম। তখন কি আর জানি যে, টিকিট কেনবার কোনো দরকারই হবে না, এমনকি স্টেডিয়ামে ঢুকবারও না, গোটা স্টেডিয়ামই আমার হোটেল ঘরের জানলায় এসে ধরা দেবে? খেলা হচ্ছে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস আর ওয়েস্টার্ন রেলের মধ্যে। দু-দলে খেলছে অন্তত সাতজন ওলিম্পিক খেলোয়াড়। যে খেলায় আসলাম শের খান, সুরজিৎ সিং, কৃষ্ণমূর্তি, অশোককুমার, গোবিন্দ, কিণ্ডো আর বলবীর সিং মুহুর্মুহু প্রতিপক্ষকে বাধা দিচ্ছে কিংবা প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে বিদ্যুদ্‌বেগে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, তা চাক্ষুষ করবার জন্যে অনেকের নিশ্চয় লাইনে দাঁড়াতে এবং রোদ্দুরে পুড়তে-পুড়তে ঘোড়সওয়ার পুলিশের ধমক খেতে কিছুমাত্র আপত্তি হবে না। আমি সেক্ষেত্রে না দাঁড়ালুম লাইনে, না পুড়লুম রোদ্দুরে, না খেলুম পুলিশের ধমক। জানলায় বসে, সিগারেট ধরিয়ে, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে দিব্যি আমি খেলা দেখছি।

দেখতে দেখতে মনে হল, একটা কোনো পক্ষের সমর্থক হয়ে যাওয়া দরকার। তা নইলে যেন খেলা দেখার আনন্দটা ঠিক জমছে না। কাকে সমর্থন করব? প্লেনে এসেছি, তাই ইন্ডিয়ান এয়ালাইনসকে সমর্থন করলেই শোভন হত, কিন্তু আসলে আমি নেহাতই মধ্যবিত্ত মানুষ কিনা, কালেভদ্রে উড়োজাহাজে ওঠবার সুযোগ মেলে, অন্য সময়ে রেলগাড়ি ভরসা, তাই প্লেন ছেড়ে শেষপর্যন্ত দুর্গা বলে রেলের দিকেই ঝুঁকে পড়লুম। ঝুঁকেই বুঝলুম, কাজটা মোটেই ভালো করিনি, কেন-না, চিরকাল এই একটা ব্যাপার দেখে আসছি যে, আমার দল কখনও জেতে না। হলও তাই। ওয়েস্টার্ন রেলকে দু-দুখানা গোল দিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস ফের চ্যাম্পিয়ন হয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এবার তাহলে সত্যজিতের খোঁজ করতে হয়। কিন্তু তিনি কত নম্বর ঘরে উঠেছেন? রিসেপশনকে ফোন করতে তারা বলল, আপনার ঠিক উলটোদিকের ঘরে। ৬১২।

একালের এক তরুণ লেখক হলে বলত, ভাবা যায়? মজা এই যে, সত্যজিৎ রায়ের ঘরে ঢুকে আমিও বললুম, "ভাবা যায়? আমি আছি ৬১১ নম্বর ঘরে। অর্থাৎ আপনার ঠিক উলটোদিকের ঘরটা আমি পেয়ে গেছি। কী করে এটা সম্ভব হল বলুন তো? আপনি এদের বলে রেখেছিলেন?"

অবাক হয়ে সত্যজিৎ বললেন, "কই না তো!"

"তাহলে?"

"নিশ্চয়ই টেলিপ্যাথি! আসুন, শামার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

ঘরের একদিকে, পুরোনো আমলের একরাশ জামাকাপড়ের সামনে, যিনি বসেছিলেন, তাঁকে দেখতে অনেকটা সুচিত্রা মিত্রের মতো। ইন্দ্রপুরি স্টুডিয়োতে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র শুটিং দেখতে গিয়েছিলুম। সেইখানে আমি শামা জায়দিকে প্রথম দেখি। তখনও এই মিলটা

আমার চোখে পড়েছিল। শামা এ বইয়ে দুটি কাজের ভার নিয়েছেন। সত্যজিতের লেখা ইংরেজি সংলাপকে তিনি, জাভেদ সিদ্দিকির সহায়তায়, উর্দুতে তর্জমা করেছেন। তা ছাড়া নিয়েছেন পোশাক ডিজাইন করবার দায়িত্ব। আমি যখন সত্যজিতের ঘরে যাই, তখন—শুধুই পোশাক নয়—টুকিটাকি এমন সমস্ত জিনিস নিয়েও কথা হচ্ছিল, যেগুলিকে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে তবেই গত শতকের আবহাওয়াটা ঠিক ফুটবে। সত্যজিতের বিছানায়, টেবিলে এবং ঘরের মেঝেতেও সেইরকমের বিস্তর জিনিস দেখলুম। তার মধ্যে একটা মস্ত বড়ো ডিবের কথা মনে পড়ে। রুপোর ডিবে। উর্দুতে বলে খাসদান। উপরে জালির কাজ করা মস্ত বড়ো গিলাফ বা ঢাকনা। শুনলুম, নবাবি আমলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পানের গিলারি বা খিলি রাখার জন্য এই ধরনের ডিবে ব্যবহার করতেন। দুটো ফরসিও দেখলুম। শামা বললেন, পেচোয়ান। শটকা দুটো ভারি বাহারি, জরির কাজের জন্যে তার চেহারা আরও খোলতাই হয়েছে।

রুপোর ডিবেটাকে হাতে নিয়ে সত্যজিৎ খুব মনোযোগের সঙ্গে সেটিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "খুলুন তো"।

বিস্তর চেষ্টা করেও পারলুম না। সত্যজিৎ বললেন, "ওই তো মজা। নীচের দিকে খুলতে হয়। অথচ নীচের দিকে খুললে তো ভিতরের খিলিগুলো ছড়িয়ে পড়ে যাবে। তাই না?"

গত শতকের মানুষেরা কি তাহলে ইউটিলিটির চেয়ে বাহারের দিকে বেশি নজর রাখত?

সত্যজিৎ কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সুরেশ জিন্দল এসে ঘরে ঢুকলেন। "মানিকদা, টাকার ভাবনা মিটে গেছে।" বলেই পকেট থেকে একমুঠো টাকা বার করে সত্যজিতের বিছানার উপরে ছড়িয়ে দিলেন তিনি।

রুপোর টাকা। 'টাকার ভাবনা' বলতে আমি ভেবেছিলুম লক্ষ টাকার ব্যাপার বুঝি। তা নয়। আসলে, নবাবি আমলের কাহিনি নিয়ে তোলা ছবি তো, তাই দরকার হয়েছিল সেই

সময়কার কিছু মুদ্রার। প্রযোজক সুরেশ জিন্দল সেগুলি জোগাড় করে এনেছেন। সত্যজিৎ সেগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর একটা টাকা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন, ওয়াজিদ আলি শাহের চাঁদির টাকা। মৎস্যকন্যার ছাপ রয়েছে।"

নকল নয়, এগুলি আসল টাকাই। শুনলুম, বাজারে এগুলি কিনতে পাওয়া যায়। এক-একটার দাম এই আমলের পঁচিশ টাকা।

আংগ্রাখা, শাল, কবা-নুমা ও অন্যান্য বস্ত্র-সম্ভার গুছিয়ে নিয়ে শামা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সত্যজিতের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি ও সুরেশ চলে গেলেন। যাবার আগে সত্যজিৎ তাঁদের আরও কয়েকটি জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ছোটোখাটো এমন কয়েকটা জিনিস, সময়টাকে দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্যে যেগুলি কিনা চাই-ই।

আমাদের দর্শকরা কি এতশত খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখেন? উত্তরটা আমার জানা নেই। কিন্তু খুঁটিনাটির দিকে সত্যজিতের এই মনোযোগের কথা অনেকের কাছেই আমি শুনেছি। স্থান ও কাল তো ধোঁয়াটে কোনো ব্যাপার নয়। তার একটা স্পষ্ট পরিচয় থাকা চাই। হরেক অভিজ্ঞানের মধ্যে সেই পরিচয়টা ধরা থাকে। যেমন ভূপ্রকৃতি, ঘরবাড়ি, আর বেশভূষা, তেমনি নিত্যব্যবহার্য নানা জিনিসপত্রের ভিতর দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। নইলে স্থান ও কালের ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। সন্দেহ নেই, যেমন তাঁর অন্যান্য ছবি, তেমনি 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র স্থান ও কালকেও সর্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইছেন সত্যজিৎ।

তখনকার মতো বিদায় নিয়ে রাত দশটা নাগাদ আবার যখন তাঁর ঘরে যাই, তখন সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে আমার চোখে পড়ে। দেখতে পাই, মস্ত একটা বাঁধানো বই খুলে স্থির হয়ে তিনি বসে আছেন। আমাকে দেখে বলেন, "১৮৫৬ সালের ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ। দৈবাৎ পেয়ে গেছি। সেই আমলের লখনউয়ের কত ছবি রয়েছে দেখুন। দেখলে বুঝতে পারবেন, তখনকার লোকজন ঠিক কী রকমের পোশাক পরত।"

কাল সকালে শুটিং শুরু হচ্ছে। তার আগে সত্যজিতের লেখা স্ক্রিপ্ট আমি পড়ে ফেলতে চাই। বস্তুত, স্ক্রিপ্ট সংগ্রহ করবার জন্যেই আমি সত্যজিতের ঘরে গিয়েছিলুম। সেটি সংগ্রহ করে জিজ্ঞেস করি, "আর কতক্ষণ জাগবেন?"

"রাত বারোটা পর্যন্ত তো বটেই। ও হ্যাঁ, কাল সকালে আটটার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ছি কিন্তু। একেবারে স্নানটান করে তৈরি হয়ে নীচে নামবেন। কখন ফিরব, তার কিছু ঠিক নেই।"

ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসছি, অত্যন্ত রূপবান একটি মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। নম্র গলায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, "মানিকদা আছেন?"

দূর থেকে সত্যজিৎ সম্ভবত তাঁর গলা শুনতে পেয়েছিলেন। বলেন, "এসো হরি।"

মানুষটিকে আমার চেনা-চেনা লাগছিল। কিন্তু হরিনামেই সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। পরনে নীল রেশমের লুঙ্গি। গায়ে নীল রেশমের জোব্বা। মাথায় ঈষৎ বাঁকানো নেপালি ধাঁচের নীল টুপি। কোথায় দেখেছি এঁকে?

সিনেমার হোর্ডিংয়ে?

হঠাৎ বুঝতে পারি, ইনি সঞ্জীবকুমার।

৩

স্ক্রিপট পড়তে-পড়তেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সত্যজিৎ এক্ষেত্রে ঠিক কোন্ পথে তাঁর পা বাড়িয়েছেন। প্রেম চন্দের গল্পের যেটা মূল বক্তব্য, এবং সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে যেটা বুঝে নেওয়া খুব শক্ত নয়, সত্যজিৎ সেটাকে ছবির দর্শকের কাছেও আবছা রাখতে চান না। বস্তুত, তারই জন্যে, মূল গল্পে যে রাষ্ট্রীয় পালাবদলের ব্যাপারটাকে আড়ালে রাখা হয়েছিল, এবং—দুই দাবাড়ুর টুকরো-টুকরো কিছু মন্তব্য বাদ দিলে—একমাত্র প্রেম চন্দের মুখেই যার কথা আমরা শুনতে পাই, সত্যজিৎ এখানে তাকে দর্শকের একেবারে চোখের সামনে এনে হাজির করেছেন।

তা যদি তিনি না করতেন, প্রেম চন্দের গল্পের পশ্চাৎপট তাহলে আদৌ স্পষ্ট হত না, এবং—ছবির দর্শকদের মধ্যে চোদ্দো আনার কাছেই—গল্পের মূল বক্তব্য তাহলে ঝাপসা থেকে যেত।

চলচ্চিত্র কলার সঙ্গে আমার পরিচয় আদৌ ঘনিষ্ঠ নয়। সিনেমাটোগ্রাফির খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যারা সরাসরি ছবি দেখে, আমি সেই দলের লোক। তাই, ছবির মাধ্যমে কোনো বক্তব্য যিনি তুলে ধরতে চান, তাঁকে যে ঠিক কোন্ ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, তা আমি বুঝি না। কিন্তু এটুকু আমিও অক্লেশে বুঝতে পারি যে, কাহিনিকারের যে একটা বাড়তি সুবিধে রয়েছে, চলচ্চিত্রকারের সেটা নেই। গল্প-কাহিনিতে



যেমন কিছু ঘটনা আমরা চরিত্রগুলির জীবনে ঘটতে দেখি, তেমনি আবার কিছু ঘটনার কথা লেখক নিজেই বলে দেন। কিছু বক্তব্য যেমন চরিত্রগুলির মুখে বসানো হয়, তেমনি আবার কিছু বক্তব্য থাকে লেখকেরও। গল্প-কাহিনির এই যে দুটি পৃথক অংশ (যার একটি রয়েছে লেখকের নিজের দখলে, অন্যটি তাঁরই সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের), সাহিত্যের পাঠক এই দুটিরই মারফতে হরেক খবর পেয়ে যাচ্ছেন, এবং তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠছে গল্পের বক্তব্য কিংবা বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর ধারণা। চলচ্চিত্রকার, সেক্ষেত্রে, দর্শকদের যা-কিছু জানাতে চান, তার সবকিছুই তাঁকে দৃশ্য আর সংলাপের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলতে হচ্ছে, আলাদা করে তিনি নিজে সেখানে আর একটি কথাও বলতে পারছেন না। যে-গল্প নিয়ে তিনি ছবি করছেন, তার পূর্বোক্ত ওই দুটি অংশকে তাই আলাদা করে দেখলে তাঁর চলে না, দুটিকে মিলিয়ে এক করে নিতে হয়।

না নিলে যে কী সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, প্রেম চন্দের এই কাহিনির দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যাবে। কাহিনির সূচনায় লেখক বলছেন, অযোধ্যায় তখন ওয়াজিদ আলি শাহ্-র শাসন চলছিল। আর সমাপ্তির কাছাকাছি এসেও—পুনশ্চ সেই লেখকেরই জবানিতে—আমরা জানতে পারলুম যে, দুই দাবাড়ু যখন খেলায় মত্ত, কোম্পানির ফৌজ তখন লখনউয়ে এসে ঢুকছে। এসব কথা যে গল্পের দুই মূল চরিত্রের মুখে আমরা একবারও শুনছি না, তা নয়; কিন্তু যেটা লক্ষণীয় ব্যাপার, সেটা এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাও বস্তুত শোনা-কথাই বলছে। ওয়াজিদ আলি শাহ্-কে কিংবা কোম্পানির ফৌজকে লেখক কোথাও, গল্পের একেবারে মূল কাঠামোর মধ্যে টেনে এনে, আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন না।

চলচ্চিত্রকার এক্ষেত্রে কী করবেন? তিনি তো তাঁর ছবি দেখাবার সময় নিজে কিছুই বলতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে, তিনি কি শুধুই তাঁর চিত্রে দৃশ্যমান দুই দাবাড়ুকে দিয়ে—খেলার ফাঁকে-ফাঁকে—অন্তরালের কথা শুনিয়ে দেবেন মাত্র? অন্তরালের ব্যাপারগুলি কী, সেক্ষেত্রে, ছবির দর্শকের কাছেও ঠিক ততটাই 'বিশ্বাসযোগ্য' হয়ে উঠবে, সাহিত্যের পাঠকের কাছে যতটা হয়েছিল?

হবে না। হওয়া সম্ভব নয়। সত্যজিৎ সে-কথা জানেন বলেই মূল গল্পে যা ছিল নেপথ্যের ব্যাপার, দর্শকের ধারণায় তাকে ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে, ছবিতে সেই ঘটনাগুলিকে তিনি সামনে নিয়ে এসেছেন। আর তারই ফলে, নির্বিকার দাবা-খেলার ব্যাপারটা এখানে—যেন-বা জাদুকাঠির ছোঁয়ায়—ভয়ংকর রকমের জরুরি সেই তাৎপর্য পেয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের চক্রান্তকে একেবারে আড়ালে রেখে দিলে যা সে কোনোক্রমেই পেত না।

তাৎপর্যের কথাটা যখন উঠলই, তখন—তারই সূত্রে—প্রাচীনকালের একটা ঘটনার তুলনা টানা যাক। আমরা শুনেছি, রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। এই নিয়ে একটা ইংরেজি লোকবাক্য তৈরি হয়েছে, কর্তব্যে অবহেলার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে অনেককে সেটা উচ্চারণ করতে শুনি। বলা বাহুল্য, এই যে বেহালা বাজানো, এর নিজস্ব কোনো তাৎপর্য নেই; আসলে রোমের সর্বনাশের সময়েও নির্বিকার হয়ে বাজনায় মত্ত ছিলেন বলেই নিরোর এই বেহালা-বাজানোর ব্যাপারটা একটা আলাদা রকমের তাৎপর্য পাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, চলচ্চিত্রকার এক্ষেত্রে কী করবেন? অগ্নিকাণ্ডকে একেবারে অন্তরালে রেখে দিয়ে—কিংবা নিরোর জবানিতে সেই অগ্নিকাণ্ডের খবরটা একবার জানিয়ে দিয়ে—তিনি কি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন শুধুই বেহালাবাদনের দৃশ্যটিকে? তা যদি তিনি করেন, নিরোর নির্বিকার আচরণের চিত্রটি তাহলে সামগ্রিক বিপর্যয়ের চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের চোখের সামনে ধরা দেবে না; এবং তার ফল দাঁড়াবে এই যে, নিরোর আচরণ যে সত্যিই খুব নির্বিকার, তাও আমরা বুঝতে পারব না।

সত্যজিৎ যদি উনিশ শতকের সেই রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের চিত্রটিকে অন্তরালে রাখতেন, এবং—মূল গল্পের একটুও পরিবর্তন না ঘটিয়ে—আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেন শুধুই দুই দাবাড়ুর নির্বিকার আচরণকে, তাহলেও ঠিক সেই সমস্যাই দেখা দিত। অর্থাৎ গল্পের দুই মূল চরিত্রের আচরণ যে তাদের পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্পর্কে সত্যিই খুব নির্বিকার, এটাই আমরা বুঝে উঠতে পারতুম না। আর তার ফল দাঁড়াত এই যে, গল্পের শরীরটা সেক্ষেত্রে বজায় থাকত বটে, কিন্তু তার বক্তব্যটা একেবারে মার খেয়ে যেত।

চলচ্চিত্রকার, এক্ষেত্রে, সম্ভাব্য সেই সংকটকে কীভাবে রুখে দিয়েছেন, তার উল্লেখ আমি আগেই করেছি। কিন্তু একইসঙ্গে আর-একটা কথাও বলা দরকার। সেটা এই যে, উলটোদিক থেকেও যে একটা বিপদ ঘনিয়ে উঠতে পারে, সেটাও নিশ্চয় তাঁর অজানা ছিল না। নিশ্চয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় পালাবদলের চিত্রটিকে সামনে টেনে আনতে হবে ঠিকই, কিন্তু এমনভাবে টানা চলবে না, গল্পের থিমকে চাপা দিয়ে যাতে সেটাই আমাদের সমস্ত আগ্রহ দখল করে নেয়। অন্তত এই স্ক্রিপ্ট পড়ে যেটুকু বুঝতে পারছি, তাতে বলতে পারি যে, দুদিকেই তাঁর সমান নজর ছিল। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি', আমার মনে হয়, একটি দ্বি-স্তর ছবি হয়ে উঠছে। একটি স্তর যেখানে অন্য স্তরের তাৎপর্যকে ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলবার জন্য অবিরত সাহায্য করে যাবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত দুটো বাজে। এবারে ঘুমিয়ে পড়া দরকার। নয়তো কাল সময়মতো ওঠা যাবে না।

২৪ জানুয়ারি। ঘুম ভাঙবার সঙ্গে-সঙ্গেই বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করি। কটা বাজে? ঘর অন্ধকার। বেড-ল্যাম্প জ্বালি। সাড়ে ছটা। কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে আসি। দরজার নীচে একটা খবরের কাগজ উঁকি মারে। সেটাকে টেনে নিয়ে দেখি, হিমাচল প্রদেশে আর জম্মু-কাশ্মীরের এক ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে প্রচণ্ড তুষার পড়েছে। তা ছাড়া, উত্তর-ভারতের হরেক জায়গায় নাকি বৃষ্টিও নেহাত কম হয়নি। সমাচার বলছে, এই বৃষ্টিতে ছোলা আর গমের ফলন ভালো হবে।

খবর পড়ে আনন্দ হয়। ছোলা আর গম যখন ভালো হবে, তখন আর কথা কি, ডাল-রুটির ব্যবস্থাটা একেবারে পাকা হয়ে গেল। গুনগুন করতে-করতে দাড়ি কামাই, স্নান করি। তারপর ঘরে ফিরে জানালার পর্দা সরিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই রে, লখনউয়ের এই হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে এখন আবার বৃষ্টিও শুরু হয়ে যাবে নাকি?

সওয়া সাতটায় নীচে নামি। গুলফাম রেস্তোরাঁয় ঢুকে চটপট চা-টোস্ট খাই। তারপর বাইরে এসে দাঁড়াই। ইউনিটের লোকেরা সবাই এসে গেছেন। লবির এক কোণে বসে সত্যজিৎ একটা কাগজ পড়ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, "আটটাতেই বেরিয়ে পড়ব তো?"

তিনি বলেন, "বাইরের অবস্থাটা একবার দেখুন।"

দেখি, ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

অপেক্ষা করতে করতে নটা বাজে। সত্যজিৎ ছটফট করছেন। স্থির হয়ে কোথাও বসতে পারছেন না। বারবার বাইরে যাচ্ছেন, আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু রোদ উঠবার লক্ষণ নেই। সাড়ে নটায় বাবু অর্থাৎ সন্দীপ বলে, "শুটিং ক্যানসেল্‌ড!"

সঞ্জীবকুমার আর সয়িদ জাফরিও এই ক্লার্ক হোটেলেই উঠেছেন। গত শতকের দুই জাগিরদারের মেক-আপ নিয়ে যে-যার ঘরে বসে আছেন, ডাক পড়লেই নীচে নামবেন। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়, আজ আর শুটিং হবে না, নীচে নামবার দরকার নেই।

তার খানিক বাদেই রোদ্দুর ওঠে। কিন্তু ইউনিটের বাসটিকে তো ইতিমধ্যে বিদায় দেওয়া হয়েছে। সবাইকে নিয়ে এখন তাই আর শুটিংয়ের জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে? সত্যজিৎ বলেন, "সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলুন, জায়গাগুলো একবার দেখে আসা যাক। সম্ভব হলে বরং ইমামবড়ার ওদিককার কিছু ছবি তোলা যাবে।"

লোক অনেক। গাড়ি মাত্র তিনটি। তার মধ্যে আমার জায়গা হবে তো?

সন্দীপ বলেছিল, "আর যা-ই করুন, ভুলেও অমন কোনো প্রশ্ন কাউকে করবেন না।"

"তার মানে?"

"তার মানে কেউ আপনাকে বলবে না যে, জায়গা হবে। নিজের জায়গা নিজে দখল করুন।"

"কীভাবে করব?"

"সামনে কোনো গাড়ি দেখলেই বডি থ্রো করুন, তারপর—যতক্ষণ না গাড়ি ছাড়ছে—নির্বিকার হয়ে বসে থাকুন।"

তা-ই করি। কিন্তু মুখে যতই নির্বিকার ভাব ফোটাই, অস্বস্তি কাটে না। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, এই হয়তো কেউ এসে বলবে, "আরে আপনি কেন জায়গা দখল করে বসে আছেন? আপনি তো আমাদের কেউ নন। নেমে আসুন। আমাদের অ্যাসিসট্যান্ট মেক-আপ ম্যানের জায়গা হচ্ছে না।"

তা কিন্তু কেউ বলে না। ঠাসাঠাসি করে জায়গা ঠিকই হয়ে যায়। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বড়ো ইমামবড়ায় পৌঁছে যাই। সত্যজিৎ আমাদের আগেই পৌঁছেছেন। ইমামবড়ার সামনে লক্ষ্মণ টিলা। তার উপরে দাঁড়িয়ে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, ক্যামেরা কোথায় বসাতে হবে।

মেঘ-ভাঙা রোদ্দুরে ইমামবড়া তখনও ঝলমল করছিল। কিন্তু ক্যামেরা ঠিকমতো বসাতে না বসাতেই আকাশ আবার অন্ধকার হয়ে যায়। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে থাকে। সত্যজিৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, "ছাতা! একটা ছাতা!"

টিলার নীচে পরপর তিনখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর থেকে একটা ছাতা হাতিয়ে নেন ভানুবাবু। তারপর দৌড়তে-দৌড়তে টিলার উপরে উঠে আসেন। আমি ভাবি, সত্যজিতের মাথা বাঁচাবার তো ব্যবস্থা হল, আমাদের কী হবে? ধারে কাছে একটা গাছও তো নেই, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে নাকি?

না, আমি ভুল বুঝেছিলুম। ছাতা যে সত্যজিতের জন্যে নয়, মুহূর্তে সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ভানুবাবুর হাত থেকে ছাতাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তিনি সেটাকে ক্যামেরার উপরে বসিয়ে দেন। সন্দীপ বলে, "চলুন, ওই বাড়িটার মধ্যে ঢোকা যাক।"

বাড়ি মানে নবাবি আমলের ধ্বস্ত জীর্ণ একটা অট্টালিকা। টিলার এক কোণে কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে আছে। টিলার উপরকার মসজিদটিকে ডাইনে রেখে, সেই বাড়িটিকে লক্ষ করে, আমরা ছুটতে থাকি।

বলছি বটে 'টিলা', কিন্তু গোমতীর তীরবর্তী এই জায়গাটিকে এখন সুন্দর একটি বাগান হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। যত্ন করে ঘাস ছাঁটা হয়েছে, এখানে-ওখানে লাগানো হয়েছে

গাছের চারা। চারাগুলো আর একটু বড়ো হলে বাহার আরও খুলবে নিশ্চয়। টিলার এই ন্যাড়া-ন্যাড়া ভাবটা তখন আর থাকবে না। রাস্তা থেকে টিলায় উঠবার সময় একটা ফলক চোখে পড়ে। ইত্রবাগ। তার মানে আতরবাগ। কিন্তু ও-নাম কাউকে বলতে শুনিনি। ‘শাহ্ পির মহম্মদ কা টিলাও’ না। সবাই বলে লক্ষ্মণ টিলা। অর্থাৎ নতুন-নতুন নামের ধাক্কা খেয়েও পুরোনো নামটা টিকে আছে। লক্ষ্মণপুর নামটা কিন্তু টিকল না। লখনউ নাকি অপভ্রংশ। আসল নাম লক্ষ্মণপুর। রামায়ণের সময়ে যার পত্তন হয়েছিল।

শরর্ বলছেন, লক্ষ্মণ টিলায় এককালে খুব গভীর একটি কুয়ো ছিল। এতই গভীর যে, তার তল দেখা যেত না। কালক্রমে সেটি বুজে যায়। টিলার উপরে এককালে অনেক ঘরবাড়িও ছিল। এখন নেই। এখন শুধু সুন্দর একটি মসজিদ চোখে পড়ে। ঔরংজেব এটি বানিয়ে দিয়েছিলেন।

ধস্ত বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আমরা মাথা বাঁচাই। একটু বাদে সত্যজিৎও আসেন। তাঁর সঙ্গে আসেন কুমারনারায়ণ ও ভারতী। কুমারনারায়ণ লখনউয়ের মানুষ। কবি হিসেবে খ্যাতি আছে। সত্যজিতের কাজ দেখতে চান। আর ভারতীর কথা পাঠকরা ভালোই জানেন। আগে মুখোপাধ্যায় ছিলেন, এখন ব্লেজ। কানাডায় থাকেন। ইংরেজিতে একখানা উপন্যাস লিখে নাম করেছেন। আপাতত কাজ করছেন সত্যজিতের উপরে।

এই বাড়িটা যে ঠিক কবে তৈরি হয়েছিল, জানি না। এখন ধসে পড়ছে। হাড়পাঁজরার মধ্যে শিকড় চালিয়েছে অশ্বত্থের চারা আর বুনো ঘাস। সামনেই সিঁড়ি। তার ধাপগুলো এতই উঁচু যে, উঠতে রীতিমতো কষ্ট হয়। আমি বলি, শত্রুকে যাতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া যায়, খুব সম্ভব তারই জন্যে এই সিঁড়ি এত খাড়াই করে তৈরি করা হয়েছিল। সত্যজিৎ হেসে বলেন, “লোকগুলোর খুব তাকত ছিল কিন্তু।”

বৃষ্টি কিছুতেই থামছে না। ঝুপঝুপ করে পড়ছে তো পড়ছেই। যন্ত্র-সরঞ্জাম গুটিয়ে অগত্যা হোটেলে ফিরতে হয়। সত্যজিৎ বলেন, “কফি খাওয়া যাক।” বেসমেন্টে কফিশপ।

সেখানে সূর্যের আলো ঢোকে না। বিজলিবাতিকেও, ফ্যাশনের খাতিরে, ঘোমটা পরিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে এমন একটা আলো-আঁধারি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, নিজেদের ঘোর ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে হয়। পরিচারক এসে টেবিলে গোটা কয়েক মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে যায়। আমার মনে পড়ে, "যেজন দিবসে মনের হরষে..."। সেইসঙ্গে ভাবতে থাকি যে, ফ্যাশন নামক ব্যাপারটা ক্রমে কতখানি হাস্যকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিজলিবাতি না থাকে তো মোমবাতি জ্বালো। তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু বিজলিবাতি থাকতেও সেটাকে ঘোমটা পরিয়ে মোমবাতি জ্বালব, এ তো নেহাতই হাস্যকর ব্যাপার।

কফিশপের দেওয়াল জুড়ে পালতোলা জাহাজের ছবি। কোম্পানির আমলের জাহাজ। তার উপরে মোমবাতির আলো কাঁপতে থাকে। কিন্তু ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। ইতস্তত ছড়ানো কিছু চেয়ার-টেবিল দেখতে পাই। কিন্তু মেঝে চোখে পড়ে না; তাই মনে হয়, অন্ধকারের মধ্যে সেগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে।

সত্যজিৎ বলেন, "দুটোর সময়ে আবার বেরুব।"

তার আগে দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে ফেলা দরকার। এখন সাড়ে বারোটা। চটপট যদি বেরিয়ে পড়ি তো বাইরের কোনো দোকান থেকে খেয়ে আসতে পারব। কফিশপ থেকে বেরিয়ে আসি। ঘরের চাবি রিসেপশনে জমা দিতে গিয়ে বেগম হজরত মহলের উপরে চোখ পড়ে। সুন্দরী রমণী। ফরসির নলটিকে মুখের কাছে ধরে নির্বিকার বসে আছেন। ভদ্রমহিলা কি জানেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে ঘোর চক্রান্ত চলছে, এবং দুদিন বাদেই তাঁকে লখনউ ছেড়ে নেপালের দিকে পালাতে হবে? মুখ দেখে তা মনে হয় না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি। একটা সাইকেল-রিকশায় উঠে দরাজ গলায় বলি, "বিরিয়ানি হাউস"।

৪

কলকাতা থেকে লখনউ রওনা হবার আগে বর্ষীয়ান একজন শুভানুধ্যায়ী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "যাচ্ছ তো, কিন্তু খাবে কী?"

প্রশ্ন শুনে আমি হতবাক্। আমতা-আমতা করে বলেছিলুম, "কেন, লখনউয়ে কি ডাল-ভাত পাওয়া যায় না?"

উত্তরে তিনি হেসে বলেছিলেন, "যায়। লন্ডনে যখন ভাতের হোটেল আছে, তখন লখনউয়েই বা থাকবে না কেন। আছে নিশ্চয়। সেখানে গেলে, ডাল-ভাত তো সামান্য কথা, মৌরলা আর পাবদা মাছের ঝোলও তুমি পেতে পারো। কিন্তু কী জানো, সারাটা জীবনই তো ডাল-ভাত আর ঝোল-ভাত খেয়ে কাটিয়ে দিলে, এবারে একটা নবাবি জায়গায় যখন যাচ্ছ, তখন একটু কোফতা-কোর্মা-বিরিয়ানি-পোলাও চেখে দেখলে ক্ষতি কি।"

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সেমিনার উপলক্ষ্যে দিল্লি গিয়ে এক উত্তরপ্রদেশি লেখকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। লখনউয়ে তাঁর পুনর্দর্শন পাই। একথা সেকথার পরে তিনিও বললেন, "এসেই যখন পড়েছ, তখন আর কিছু না-খাও, পরোটা আর কাকোরি-কাবাব খেয়ে যেয়ো।"

কাকোরি-কাবাবের গল্প আমি কলকাতাতেই শুনেছিলুম। মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়, এমন মিহিপেষাই মাংসের কাবাব নাকি লখনউয়ের বাইরে কুত্রাপি মেলে না। লখনউয়ে এসে, উপরন্তু পরোটার গল্পও শোনা গেল।

সেও নবাবি গল্প। নবাব গাজিউদ্দিন হায়দার নাকি পরোটা পছন্দ করতেন। রোজ তাঁর আধ-ডজন পরোটা চাই। কিন্তু এ তো রামা-শ্যামার পরোটা নয়, নবাবি পরোটা, সুতরাং সেই ছ-খানা পরোটার জন্য রোজ ঘি-র দরকার হত তিরিশ সের। বড়ো উজির মোতামোদউদ্দৌলার সন্দেহ হল, বাবুর্চি নিশ্চয় ঘি চুরি করছে। তিনি বললেন, পাঁচ সেরই যথেষ্ট, তার বেশি ঘি দেওয়া হবে না। কিন্তু পাঁচ সের ঘিয়ে তৈরি ছ-খানা পরোটা খেয়ে নবাব কেন খুশি হবেন? তিনি বললেন, ‘‘ব্যাপার কী, পরোটায় সেই আগের মতো স্বাদ হচ্ছে না কেন?’’ বাবুর্চি বলল, ‘‘হবে কী করে, ঘি পাচ্ছি না। আগে যেখানে রোজ তিরিশ সের ঘি পেতুম, এখন সেখানে পাঁচ সের পাচ্ছি।’’ ঘিয়ের বরাদ্দ কে কমিয়েছেন? না বড়ো-উজির। বটে? ডাকো তাকে। মোতামদউদ্দৌলা তো সমন পেয়ে নবাবের কাছে এলেন। নবাব জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘একে ঘি দিচ্ছ না কেন?’’ বড়ো উজির বুঝতে পারেননি যে, জল ইতিমধ্যে অনেক দূর গড়িয়েছে। তিনি বললেন, ছ-খানা পরোটার জন্যে তিরিশ সের ঘিয়ের দরকার হতেই পারে না। ‘‘জাঁহাপনা, আপনার বাবুর্চি সব লুটে নিচ্ছে।’’

এই পর্যন্ত বলে অবাঙালি বন্ধুটি বললেন, ‘‘তারপর কী হল বলো তো?’’

আমি বললুম, ‘‘বাবুর্চির গর্দান নেওয়া হল।’’

বন্ধু বললেন, ‘‘দূর, তাই কখনও হয়? বড়ো উজিরকে তিন থাপ্পড় মেরে নবাব গাজিউদ্দিন হায়দার বললেন, কম্‌বখ্‌ত, আমার এই রাজ্য তুমি লুটেপুটে খাচ্ছ, আর এই রকাবদার যে রোজ মাত্র তিরিশ সের ঘি নেয়, তাও আমারই পরোটার জন্যে, সেটা তোমার সহ্য হচ্ছে না?’’

আমি বললুম, ‘‘যাক বাবা, বড়ো উজিরের গর্দান যে কাটা পড়েনি, স্রেফ কয়েকটা থাপ্পড়ের উপর দিয়েই ব্যাপারটা মিটে গেছে, এই যথেষ্ট।’’

বন্ধু বললেন, ‘‘ঠাট্টা নয়। শরর-এর বইয়ে ওই ঘটনাটার উল্লেখ আছে। দেখে নিয়ো।’’

শরর অবশ্য এই একটা নয়, নবাবি খানাপিনার আরও অনেক গল্প বলেছেন। নবাব শুজাউদ্দৌলা-র দস্তরখানে পরিবেশিত খাদ্যে কবে একটি মৃত মক্ষিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল,

এবং মেহরি অর্থাৎ দাসী কীভাবে নবাবের শ্যালক সালারজঙ্গ-এর বাবুর্চিখানার উপরে দোষ চাপিয়ে সে-যাত্রা নবাবি বাবুর্চিখানার নায়েব মুনতজিম অর্থাৎ সহকারী ব্যবস্থাপককে বাঁচিয়ে দেয়, আবার সালারজঙ্গ-এর বাবুর্চির তৈরি পোলাওয়ের মাত্র চারটি গ্রাস খেয়েই নবাব শুজাউদ্দৌলা-র ছাতি কীভাবে তৃষ্ণায় বিদীর্ণ হবার উপক্রম হয়েছিল, কিংবা লখনউয়ের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ কীভাবে মোরব্বাসদৃশ কোর্মা খাইয়ে দিল্লির শাহজাদা মির্জা আশমান কদ্রকে ধোঁকা দেন, এবং শাহজাদাই বা কীভাবে তার পালটা জবাব দিয়েছিলেন, কিংবা নবাব সাদত আলি খাঁ-র ওদাসীন্যে মর্মাহত হয়ে নবাগত এক বাবুর্চি কীভাবে তার অতিযত্নে রান্না করা মাসকলাইয়ের ডাল একটা শুকনো গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়েছিল, এবং দিন কয়েক বাদে সেই মৃত বৃক্ষটি কীভাবে পত্রপুষ্পে পুনশ্চ ঝলমল করে ওঠে, কিংবা গুলজার পোলাও, নূর পোলাও, কোকো পোলাও, মোতি পোলাও, আর চম্বেলি পোলাও খেয়েও যাঁদের তৃপ্তি হত না, প্রতিটি চালের অর্ধাংশ লাল আর অর্ধাংশ সাদা রেখে আনারকলি পোলাও এবং ন-রঙা চাল দিয়ে নওরতন পোলাও রান্না করে কীভাবে তাদের মনোরঞ্জন করা হত, শরর সে সব গল্প এত রসিয়ে-রসিয়ে বলেছেন যে, ভোজনবিলাসী সেই নগরজীবনের আবহটিকে আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারি।

সব গল্পই মজাদার। প্রতিটি গল্পই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, নবাবি লখনউয়ের ভোজনবিলাস বস্তুত চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল। একটা নমুনা দিই। দুধ যাতে সুবাসিত হয়, দিল্লির বাদশাহেরা তার জন্যে নাকি গোরুকে গোলাপজল খাওয়াতেন। লখনউয়ের নবাবদের জন্যে সেক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে কেসর ও কস্তুরীর গুলি খাইয়ে মুরগি তৈরি করা হত। তবে, রন্ধনকলার যেটা সূক্ষ্ম দিক, সেটা সম্ভবত সব চাইতে বেশি করে ধরা পড়েছে সেই পালোয়ানের গল্পে, লখনউয়ের ধনী নাগরিক হকিম বান্দা মেহদি—স্রেফ মজা করবার জন্যে—যাঁকে সারাটা সকাল উপবাসী রেখে অতঃপর নিতান্ত এক ছটাক পোলাও পরিবেশন করেছিলেন। যে-ব্যক্তির আহার্যের তালিকা হল সকালে কুড়ি সের দুধ ও তিন সের মেওয়া

এবং দুপুরে ও রাত্রে আড়াই সের আটার রুটি ও আস্ত একটি পাঁঠা, মাত্র এক ছটাক পোলাও দিয়ে প্রাতরাশ সারবার প্রস্তাব শুনে তিনি যদি রেগে আগুন হয়ে উঠে থাকেন, তবে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। হকিম তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "খানা এখনও তৈরি হয়নি, আপাতত এই বাসী পোলাওটুকু দিয়ে পিত্তরক্ষা করুন।" গল্পের মজাটা এইখানে যে, ওই এক ছটাক পোলাও খেয়েই পালোয়ানজির খিদে নাকি মিটে গিয়েছিল..., অন্তত সেদিন তিনি আর কিছুই খেতে পারেননি। বলা বাহুল্য, হাকিম একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। সেটা এই যে, মানুষ তো গোরু-মোষ-হাতি নয়, সে তাই পরিমাণে বেশি খাবে কেন? সে মাত্র কয়েক গ্রাস খাবে, কিন্তু তাতেই তার এমন তাকত হবে, বিশ-তিরিশ সের খেয়েও যা হয় না।

তাকত বাড়াবার জন্যে পোলাও-বিরিয়ানি খাওয়াটাই প্রশস্ত কি না, খাদ্যতাত্ত্বিকেরা তা বলতে পারবেন। আমার শুভানুধ্যায়ী সেদিক থেকে কিছু বলেননি। তাঁর বক্তব্য, তাকত বাড়ুক আর না-ই বাড়ুক, সুযোগ পেলে মুখটা মাঝেমধ্যে একটু পালটানো ভালো। বস্তুত, সেই জন্যেই একটা সাইকেল-রিকশায় উঠে আমি 'বিরিয়ানি হাউস'-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু কপাল খারাপ। নিকটবর্তী একটি সিনেমা হাউসের সংলগ্ন যে রেস্তোরাঁটিকে আমি—স্রেফ নাম দেখেই—পছন্দ করে ফেলেছিলুম, যথাস্থানে পৌঁছে দেখি যে, তার দরজা বন্ধ। পাশের দোকানে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সন্ধের আগে ওরা খাদ্য পরিবেশন করে না।

বেলা দুটোয় হোটেলে ফিরি। সকালে শুনেছিলুম দুপুরের খাওয়া সেরে লখনউ জাদুঘরে যাওয়া হবে। রওনা হতে-হতে আড়াইটে বেজে যায়। দুটো গাড়ি। প্রথমটিতে আছেন সত্যজিৎ। দ্বিতীয়টিতে আমরা তাঁকে অনুসরণ করছি। চৌকের দোকানপাট বাঁয়ে রেখে আমরা তুলসীদাস মার্গ ধরে এগিয়ে যাই। তারপর বড়ো রাস্তায় গাড়ি রেখে ডাইনে একটা

ঘুপচি গলির মধ্যে ঢুকে পড়ি। সরু গলি। যেমন ঘিঞ্জি, তেমনি ঘিনঘিনে। এই এখনকার জহুরি মহল্লা। ঘরবাড়ি জরাজীর্ণ, পুরোনো লখনউয়ের সাক্ষী হয়ে কায়ক্লেশে টিকে আছে। রাস্তার উপরে এখানে-ওখানে এমনভাবে খাটিয়া পাতা যে, সহজে যাতায়াত করা যায় না, ডিং মেরে-মেরে এগোতে হয়। সর্বত্র গোরু, ছাগল আর মোষের নাদি। গোটা কয়েক মুরগির ছানা অকুতোভয়ে চরে বেড়াচ্ছে। তরকারির খোসা, ছাইয়ের স্তূপ। তার উপরে আবার সকালে জোর বৃষ্টি হওয়ায় গোটা রাস্তা জলে-কাদায় পিছল হয়ে আছে। বিপদ বাঁচিয়ে পা ফেলতে হচ্ছে, একটু অসাবধান হলেই চিতপটাং হবার আশঙ্কা। সত্যজিতের কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝেমাঝে থেমে দাঁড়াচ্ছেন এবং বাড়িগুলিকে নজর করে দেখছেন। দু-পাশের অনেক বাড়িই পুরোনো আমলের পাতলা ইটে তৈরি। আস্তর খসে পড়েছে। দেওয়াল ফুঁড়ে মাথা তুলেছে অশ্বত্থের চারা আর বুনোঘাস। দু-একটা বাড়ির খানিক-খানিক জায়গায় পুরোনো ইট খসিয়ে নতুন ইট গাঁথা হয়েছে। ঠেকনো দিয়ে যতদিন চালানো যায়।

সত্যজিৎ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, "নাঃ, এতে হবে না! চলো, আর-একটা গলি দেখা যাক।"

ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি যে, আমরা আসলে জাদুঘর দেখতে বার হইনি। বেরিয়েছি এমন একটা গলি খুঁজতে যার মধ্যে পুরোনো লখনউয়ের আদলটা একটু বেশি মাত্রায় মেলে। তারই সন্ধানে আমরা বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে এসে, খানিক এগিয়ে, ফের বাঁ দিকের গলিতে ঢুকি। কী নাম এই এলাকার? সরকাটারি। ওই গলিটার? শহ্‌চ্‌রা। গলির গায়ে নাম লেখা রয়েছে। তবু, আলাপ জমাবার জন্যে, স্থানীয় একজন লোককে জিজ্ঞেস করি, এ গলির নাম কী ভাইসাব? উত্তরে সে এমনভাবে শহ্‌চ্‌রা কথাটাকে উচ্চারণ করে যে, সেটা একেবারে ছ্যাচড়ার মতো শোনায়।

ছ্যাচড়া গলিতে পালকির খোঁজ মেলে। ছবিতে ঠিক এইরকম একটা পালকি দরকার। মালিকের নাম কাল্লু মিঞা। বুড়ো। রাস্তার ধারে একটা উঁচু ভিটের উপরে পালকি বসানো।



সেখান থেকে নামিয়ে এনে পালকিটা তক্ষুনি আমাদের দেখানো যায় কি না, জিজ্ঞেস করতে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বুড়ো জানায়, না। নামালে নাকি তার সংসারটাকেই নামিয়ে আনতে হবে। আমরাই অগত্যা কাদার মধ্যে পা টিপে-টিপে সেই উঁচু জায়গায় উঠে যাই। উঁকি মেরে দেখি, বুড়ো মোটেই মিথ্যে বলেনি। আসলে ওই পালকিই তার ঘরবাড়ি। তার মধ্যে তার বিছানা পাতা। তারই মধ্যে তার সান্‌কি, গেলাস, সুরাহি আর বদ্‌নাটিকে সে গুছিয়ে রেখেছে। একটি কুকুরছানাও দেখলুম। আমাদের দেখে ঘনঘন লেজ নাড়তে ও কুঁই-কুঁই করতে লাগল। বুড়ো কি তার পালকিটাকে ভাড়া খাটাবে? হ্যাঁ, খাটাবে, যদি টাকা পায়। কত টাকা? কাল্লু মিঞা মনে মনে একটা হিসেব কষে নেয়। তারপর বলে, ‘‘পঁয়ত্রিশ।’’

যাক্ বাবা, পালকির তো ব্যবস্থা হল। এখন চলো, মির অনিসের বাড়ির সন্ধানে যাই।

মির অনিসের নাম কে না জানে। নবাবি লখনউয়ের দুই সমসাময়িক মস্ত কবি ছিলেন মির জমির আর মির খালিক। প্রথমজনের শিষ্য মির্জা দবির এবং দ্বিতীয়জনের পুত্র মির অনিস। কালক্রমে তাঁদের খ্যাতিও তুঙ্গে উঠেছিল। ধর্মীয় শোকগীতি মর্সিয়াগোঈ রচনায় দুজনেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অনিস উপরন্তু খো-আনি বা কাহিনিকাব্যও চমৎকার লিখতেন। বাগ্‌ভঙ্গিমায় দুজনে অবশ্য দুই ভিন্ন পথের পথিক। দবিরের খ্যাতি অলংকৃত শব্দসম্ভার ও পাণ্ডিত্যের জন্য; অনিসের সমাদরের প্রধান কারণ সেক্ষেত্রে সহজ-সরল কাব্যভাষা, সরাসরি যা কিনা পাঠকের মর্মে গিয়ে ঘা দেয়। শুনেছি, দবির আর অনিসের মধ্যে বেশ একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার ছিল। দুজনেই দুটি মস্ত মাপের ভক্তগোষ্ঠী তৈরি করে তুলেছিলেন, এবং শাইরির মজলিশে এই দুই লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির মধ্যে যখন উতোর-চাপান চলত, তখন নাকি দেখা যেত যে, দুই শিবির থেকেই মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠছে।

মির অনিসের বাড়ির সন্ধানে আমরা আবদুল আজিজ রোডে এসে পৌঁছই। গাড়ি থামাই একটা মস্ত বাড়ির পাশে। নালা পেরিয়ে গলিতে ঢুকি। পুরোনো লখনউয়ের এই গলিগুলো যেন শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে আছে। খানিক বাদেই সব তালগোল পাকিয়ে

যায়; কোন্ গলিটা যে কোথায় গিয়ে মিশবে, ঠাহর করা যায় না। নোংরা সেই গলিঘুঁজির মধ্যে কানামাছির মতো আমরা হাঁটতে থাকি; তারপর হঠাৎ একসময়ে মির অনিসের বাড়ির সন্ধান পেয়ে যাই। ধ্বস্ত বাড়ি। মস্ত দরজা। দরজার মাথায় মাছের নিশান। এই মাছই হল অযোধ্যার নবাবি প্রতীকচিহ্ন। দরজা পেরিয়ে কবিভবনে ঢুকতে গিয়ে বাধা পাই। নাকি ভিতর-বাড়িতে মেরামতির কাজ চলছে, ঢোকা যাবে না। সে কী। দরজায় লটকানো নোটিসে তো তেমন কথা লেখা নেই। বরং তাতে বলা হচ্ছে, শীতের দিনে দশটা থেকে চারটে অবধি ভিতরে ঢোকা যাবে। শুনে, কবিভবনের তত্ত্বাবধায়ক বলেন, ও, তাই বুঝি, তাহলে ঢুকুন। ঢুকে অবশ্য পায়ের নীচে ধ্বস্ত পলেস্তারা, মাথার উপরে বিপজ্জনকভাবে প্রলম্বিত কিছু কড়ি-বরগা, এবং চত্বরে একটা মস্ত চৌবাচ্চা ছাড়া আর কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না। ভাঙাচোরা সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির ছাতে উঠলে কিন্তু সুন্দর একটি মসজিদ দেখা যায়।

অনিসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা চৌকের দিকে চলে আসি। দুদিকের দোকানপাট ছাড়িয়ে আবার একটা গলিতে ঢুকি। তারপর খানিক এগিয়ে মনে হয়, জায়গাটা আমাদের চেনা। সত্যজিৎ বলেন, "আর-কিছুক্ষণ হাঁটলে আবার সেই কবিভবনেই পৌঁছে যাব। তার চেয়ে আসুন, একটু চা খাওয়া যাক।" পথের পাশে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা চা খাই। চায়ের পরে পান। সন্ধে হয়ে আসছে। এবারে হোটেলে ফিরব। চৌকের পথ ধরে আমরা হাঁটতে থাকি। দুদিকে হরেকরকমের দোকান। আহমদ আলি ও দিলদার আলির 'ভারত বিখ্যাত' তামাকের দোকান, ইতর্ অর্থাৎ আতরের দোকান, চিকনের শাড়ির দোকান, চালকুমড়োর পেঠার দোকান। দূর থেকে একটা ঠকাঠক্-ঠকাঠক্ শব্দ ভেসে আসে। সত্যজিৎ বলেন, "কীসের শব্দ বলুন তো?"

"তাঁতের?"

সত্যজিৎ হেসে বলেন, "না। ধাতুর পাত পিটিয়ে পিটিয়ে তবক বানানো হচ্ছে। একটু

আগে যে তবকে মোড়া পান খেলেন, সেই তবক। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ এই শব্দের কথা বলেছি। সেটা অবশ্য লখনউ নয়, বেনারসের ব্যাপার।"

হোটেলে ফিরে দেখি, ঘরের জানালায় ছোট্ট একটা বাঁদর বসে আছে। সকালেও এই দুধের বাচ্চাটাকে জানালায় বসে থাকতে দেখেছিলুম। কাচের ওদিক থেকে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। ঘরে ঢুকতে চায়?

খবর পেয়ে সত্যজিৎ আমার ঘরে আসেন, এবং অনেকক্ষণ ধরে সেটিকে পর্যবেক্ষণ করে বলেন, "আশ্চর্য! সাত তলায় এটা উঠল কী করে?"

রাত আটটায় সন্দীপ এসে ডেকে নিয়ে যায়। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র কিছু স্টিল দেখানো হবে। গিয়ে দেখি, সঞ্জীবকুমারও হাজির। কিছু ছবি সত্যি বড়ো মনোরম হয়েছে। বিশেষ করে শাবানা আজমির একটি ছবি। নরম আলো সেখানে এমন একটা মেজাজ এনে দিয়েছে যে, দেখলেই ভালো লেগে যায়। 'জন অরণ্য'-এ মোমবাতির আলো যে মেজাজ এনে দিয়েছিল, তার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু সেখানে রং ছিল না। এখানে রং থাকায় ব্যাপারটা আরও জমেছে।

নটায় নীচে নামি। ডাইনিং হল-এ ঢুকি। ভারতী মুখুজ্যে একা এক কোণে বসে আছেন। খানিকবাদে সপরিবার সত্যজিৎ এসে ঢোকেন। আমার পাশের টেবিলে একটি বাঙালি পরিবার। এতক্ষণ তাঁরা নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিলেন। এইবারে তাঁরা কাঁটা ও ছুরি নামিয়ে রাখেন। কানাকানি শুরু হয়ে যায়। যাঁকে এই পরিবারের বাবা বলে মনে হয়, চাপা গলায় তিনি বলেন, "কী, বলেছিলাম না?"

উত্তরে, যাঁকে এই পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা বলে মনে হয়, তিনি বলেন, "তাহলে নিশ্চয় সঞ্জীবকুমারও আসবে।"

বাবা: "কিন্তু আর বসি কী করে? খাওয়া যে শেষ হয়ে গেল।"

কন্যা: "আর-একটা ক্যারামেল কাস্টার্ডের অর্ডার দাও।"

৫

২৫ জানুয়ারি। আজ ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙে, আকাশটা তখন নীলে আর সোনায় যেন ঝলমল করছিল। রাত্তিরে শুতে যাবার আগে জানালার পর্দা দুদিকে সরিয়ে রেখেছিলুম। ঘুম ভাঙতেই তাই আশ্চর্য সেই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। টলটলে নীল আকাশ। তার মধ্যে টুকরো টুকরো কয়েকটা মেঘ। স্থির হয়ে তারা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, আর ভোরবেলাকার নবীন রোদ্দুর, যেন বা এক অলৌকিক দর্জির মতো, তাদের কিনারে-কিনারে সোনালি জরির পাড় বসিয়ে দিচ্ছে। মনে হল, আহা, যেন অনাদি আনন্দের একখানি চিরস্থির ছবি। মেঘের ময়লা ন্যাতা বুলিয়ে সেই ছবি যে কেউ মুছে দিতে পারে, এমন কথা তখন কল্পনাও করিনি।

অথচ, স্নান করে, কাপড়জামা পালটে, বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে যখন নীচে নামলুম, আকাশের মুখ তখন সেই গতকাল সকালের মতোই অন্ধকার। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। হোটেলের লবিতে গুম হয়ে সবাই বসে আছি। কাল রাত্তিরে সত্যজিতের ঘরে কামু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ছবির বাইরে এই তাঁকে প্রথম দেখলুম। ফুর্তিবাজ মানুষ। সারাক্ষণ টগবগ করছেন। হাসতে ও হাসাতে ভালোবাসেন। আজও তিনি মজার-মজার সব গল্প বলে সবাইকে একটু চাঙ্গা করবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা, তাতে চাঙ্গা হওয়া শক্ত। কারও মুখেই হাসি ফুটছে না।

দশটা নাগাদ সূর্য ওঠে। মেঘ কেটে গিয়ে গোটা ইউনিটের মুখে অমনি রোদ্দুর ছড়িয়ে যায়। এখন অবশ্য শুটিং হবে না, তার সময় নেই। যেটুকু সময় আছে, তাতে বড়োজোর লোকেশন বাছাইয়ের জন্যে একটা চক্কর দিয়ে আসা যেতে পারে। তবে তাই হোক। চটপট আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি। সেই কালকের মতোই আবার পথে-পথে এখন ঘুরে বেড়াব।

সত্যজিতের গাড়ি আগে বেরিয়ে যায়। আমাদের গাড়ি, কী একটা অকাজে আটকে গিয়ে মিনিটখানেক দেরি করে। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, রাস্তায় বেরিয়ে সত্যজিৎকে আর খুঁজে পাই না। খানিক এগিয়ে রাস্তাটা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। কোন্ দিকে যাব? ডাইনে না বাঁয়ে? পাঁচ সেকেন্ড মাথা ঘামিয়ে সন্দীপ বলে, কাল তো বাঁয়ে মোড় নিয়েছিলুম, আজ বরং ডাইনে যাওয়া যাক। তা-ই যাই। খানিক বাদে সত্যজিতের গাড়ি আমাদের চোখে পড়ে। সবাই মিলে মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে গিয়ে ঢুকি। না, কারও স্বাস্থ্য পরীক্ষার দরকার নেই, আসলে এই এলাকায় এমন একটা উঁচু বাড়ি চাই, যার ছাত থেকে ইমামবড়ার দৃশ্যটাকে ঠিকমতো ধরা যাবে। সেইজন্যেই এখানে আসা। গাড়ি থেকে নামতেই কিন্তু ভিড় জমে যায়। ব্যাপারটা সবাই আঁচ করেছে। সত্যজিৎকে শনাক্ত করতে পাবলিকের কিছুমাত্র দেরি হয় না। কিন্তু ভারতীকে নিয়ে তারা একটু ধাঁধায় পড়ে। কে ইনি? ভিড়ের ভিতর থেকে মুরুব্বি গোছের একটি লোক বলে, "নিশ্চয় শাবানা আজমি।" ভারতী ঢোঁক গেলেন। আমি বলি, "তাহলে আর কানাডায় ফিরে যাবার দরকার কী? হিরোইনের আসনটা যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন বরং স্বদেশেই থেকে যান।"

মেডিক্যাল কলেজের ছাতে-ছাতে অনেকটা সময় কেটে যায়। তারপর আবার গলি খুঁজতে বেরোই। পৌঁছই কাশ্মীরি মহল্লায়। পুরোনো গলি। পুরোনো বাড়ি। পলেস্তারা খসে গিয়ে উঁকি মারছে পাতলা ইট। এসব বাড়ি কি এই শতাব্দীর? অন্তত কয়েকটি নিশ্চয় গত শতকে তৈরি হয়েছিল। বাড়ির সামনে, সদর-দরজার মাথায়, মাছের প্রতীকও চোখে পড়ে। সত্যজিৎ তবু খুশি হন না। ভুরু কুঁচকে বলেন, "এখানেও সেই ইলেকট্রিক লাইটের থাম আর রেনপাইপ।"

অর্থাৎ এতেও হবে না। ফিরে চলো। এমন গলি চাই, যেখানে বিজলিবাতির স্তম্ভ নেই। এমন বাড়ি চাই, যার গায়ে এখনও রেনওয়াটার পাইপ বসেনি। তেমন গলি, তেমন বাড়ি কোথায় পাব?

শামার আত্মীয়া শাবা এই লখনউয়ের বাসিন্দা। হাসিখুসি মেয়ে। এ যাত্রায় তিনিই আমাদের গাইড। বলেন, ''পাওয়া কি আর যাবে না? যাবে নিশ্চয়। তবে কিনা খুঁজতে হবে। খুঁজতে-খুঁজতে পেয়ে যাব।''

ফিরে আসছি, এমন সময় পাড়ার একজন বৃদ্ধ বাসিন্দা মন্তব্য করেন, ''আর একটু এগোলেই তো দরগা। তাহলে তোমরা ফিরে যাচ্ছ কেন? পথ চিনতে পারনি, তাই না?''

শাবা বলে, ''ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা দরগার খোঁজে আসিনি।''

''তাহলে?''

''একটা বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, তার ঠিকানাটা আমাদের জানা নেই।''

বৃদ্ধটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা গিয়ে আর-একটা গলিতে ঢুকে পড়ি। রাস্তায় জলকাদা। পা হড়কে যায়। বাড়ির সামনের রোয়াকে বসে ছোট্ট একটি ছেলে খুব গম্ভীরভাবে সেই জলকাদার উপরে তার লাঠি বাড়িয়ে ধরেছে। সত্যজিৎ বলেন, ''কি খোকা, মাছ ধরছ বুঝি?'' খোকা কোনো উত্তর দেয় না।

বুঝতে পারছি, আরও অনেক গলি আমাদের দেখতে হবে। তারপরে সত্যজিৎ ঠিক করবেন যে, কোন্ কোন্ গলি তাঁর কাজে লাগবে। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু সত্যজিতের ক্লান্তি নেই। প্রত্যেকটা গলির প্রত্যেকটা বাড়ির উপরে চোখ বুলিয়ে তারপর যেভাবে তিনি বলছেন, ''চলো, আর একটা গলি দেখা যাক'', তাতে মনে হয়, লখনউয়ের এই পুরোনো মহল্লাগুলিকে একেবারে উলটে-পালটে না দেখে তিনি ছাড়বেন না। সবচেয়ে ভালো গলিটা তাঁর চাই-ই। সবচেয়ে ভালো মানে সবচেয়ে বিশ্বাস উৎপাদনকারী। বুঝতে

আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না যে, পুরোনো লখনউয়ের একটা স্পষ্ট ছবি তাঁর মনের মধ্যে ধরা রয়েছে। বাইরের ছবিটাকে তার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে নিতে চান। যতক্ষণ না ঠিকঠাক মেলাতে পারছেন, ততক্ষণ তিনি থামবেন না।

বারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরি। হোটেলের একতলায় ডাকঘর। কলকাতায় চিঠি লিখি। তারপর লবিতে ফিরে দেখি, সত্যজিৎ হাসছেন। ব্যাপার কি? না, বাচ্চা পাওয়া গেছে। কোন্ বাচ্চা? কার বাচ্চা? সত্যজিৎ বলেন, কাল্লু।

কাল্লু মানে ছোট্ট সেই ছেলেটি, লখনউয়ের বাইরে এক গ্রামাঞ্চলে যার সঙ্গে মির্জা আর মিরের দেখা হয়েছিল। দুই দাবাড়ুকে পথ দেখিয়ে যে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে। যাতে সেই বাড়ির উঠোনে ছক পেতে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভুলে গিয়ে—নিশ্চিন্ত চিত্তে তারা দাবা খেলতে পারে।

কে একজন বলেন, "আর কাউকে দেখবেন না?"

সত্যজিৎ বলেন, "না। এমন বাচ্চা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। স্রেফ কাল্লুর ভূমিকায় নামবার জন্যেই ওকে তৈরি করা হয়েছিল।"

মূল গল্পে কাল্লু নামে কোনো চরিত্র নেই। এটি সত্যজিতের সংযোজনা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি ধরতে পারি যে, গল্পের থিমটিকে ঠিকমতো বিস্তারিত করবার প্রয়োজনে যখনই এই চরিত্রের কথা সত্যজিৎ ভাবেন, তখনই তাঁর মনের মধ্যে কাল্লুর একটি মুখচ্ছবি তৈরি হয়ে যায়। বাস্তবের ছবিটি সেই কল্পনার ছবির সঙ্গে মিলে গেছে বলেই সত্যজিৎ এক্ষেত্রে আর খোঁজাখুঁজির কথা ভাবছেন না।

আকাশ পরিষ্কার। ধোবাবাড়ি থেকে কাচিয়ে আনা ধপধপে থান-কাপড়ের মতো রোদ্দুর উঠেছে। আজ বিকেলে শুটিং হবে।

শুটিং হবে দিলখুশা বাগানে। অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ায়। হোটেলের সামনে ইউনিটের বাস দাঁড়িয়েছিল। দেড়টার মধ্যে আমরা তাতে উঠে পড়লুম। মস্ত বাস। বিস্তর লোক। গল্প

করতে-করতে যাওয়া যাবে। কামু মুখুজ্যে যখন সঙ্গে আছেন, তখন সময়টা নিশ্চয় খারাপ কাটবে না।

রওনা হতে হতে দুটো বেজে গেল। বাগানে পৌঁছলুম আড়াইটে নাগাদ। বিরাট বাগান। প্রচুর গাছপালা। আজ ছুটির দিন নয়। ইস্কুল, কলেজ, কোর্ট, কাছারি সবই খোলা। কিন্তু সেই দুপুরবেলাতেও দেখলুম ভিড় জমে গেছে। কী করে খবর পায় এরা? প্রচুর পুলিশ এসেছে। যথাসাধ্য তারা ভিড় ঠেকাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পেরে উঠছে না। সত্যজিৎ আমাদের আগেই এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি কাজে লেগে গেছেন। তাঁরই নির্দেশে, খানিকটা দূর থেকে, লোহার দুটো বাগান-বেঞ্চি তুলে এনে একটা বটগাছের তলায় রাখা হল। পুরোনো বটগাছ। ডালপালা থেকে রাজ্যের ঝুরি নামিয়ে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দু-চারজন উৎসাহী দর্শক পুলিশের চোখ এড়িয়ে বটগাছে উঠে বসেছিল। তাদের নামানো হল। সত্যজিৎ এগিয়ে এলেন। একটা লাঠির ডগা দিয়ে মাটির উপরে তিনি দাগ কাটছেন। কিছু আঁকছেন নাকি? হ্যাঁ, দাবার ছক! সঞ্জীবকুমার বেঞ্চিতে এসে বসলেন। পাশে ঠোঙাভরতি বাদাম। অন্যমনস্কভাবে বাদাম খেতে খেতে খোসাগুলোকে তিনি সেই ছকের উপরে ফেলছেন, তারপর ছড়ি দিয়ে সেগুলিকে ইতস্তত সরিয়ে দিচ্ছেন। একটা কিছু চালের কথা ভাবছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

বেচারা মির্জা। সে তো বাড়িতে বসেই দাবা খেলতে চায়। কিন্তু তার বউয়ের তাতে আপত্তি। বউ চায়, স্বামীর লক্ষ, শতরঞ্জের বদলে, তার দিকে নিবন্ধ হোক।

সয়িদ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও ঈষৎ অন্যমনস্ক।

বেচারা মির। মির্জার বাড়িতে আর দাবা খেলবার সুবিধে নেই। সে তাই নিজের বাড়িতে শতরঞ্জ সাজিয়ে বসেছিল। কিন্তু বাড়ির মধ্যে দাবার আড্ডা বসুক, তার বউ-ই কি সেটা চায়? না, সেও চায় না। না চাইবার কারণটা অবশ্য এক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন।

কিন্তু কারণ যার ক্ষেত্রে যাই হোক, ফলটা দাঁড়িয়েছে এই যে, দুই দাবাড়ুকে এখন ঘর

ছেড়ে পথে-পথে ঘুরতে হচ্ছে। এমন একটা জায়গা খুঁজতে হচ্ছে, যেখানে তাদের ব্যসনে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

ট্র্যাক পাতা হয়েছে। ট্রলি বসানো হল। ট্রলির উপরে ক্যামেরা। ক্যামেরার চোখ সয়িদের দিকে।

"সায়লেন্স। অ্যাকশন।"

সয়িদ আস্তে-আস্তে সঞ্জীবের দিকে এগিয়ে আসছেন। "শুনা আপ্‌নে? আব মুনশি নন্দ্‌লালকা কেয়া হোগা?"

"কাট্‌।" মাথার উপরকার কালো কাপড় ফেলে দিয়ে ক্যামেরার পিছন থেকে উঠে দাঁড়ালেন সত্যজিৎ। ভুরু কোঁচকানো। দেখেই বোঝা যায়, দৃশ্যটা তাঁর পছন্দ হয়নি। কোথায় গণ্ডগোল হল? সত্যজিৎ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু বলছেন না। হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন। তারপর সয়িদের দিকে ঘুরে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "আই উড সাজেস্ট্‌ ইউ সে 'মুনশি নন্দ্‌লাল' ফ্রম দেয়ার, অ্যান্ড দেন, ফর দি রেস্ট অব দি স্টেটমেন্ট্‌, ইউ কাম ফরওয়ার্ড।" তারপর, সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে, "হরি, ইউ আর ও.কে.।"

ভিড় এদিকে বেড়েই যাচ্ছে। দূরে, বাগানে ঢুকবার প্রবেশ পথের ঠিক পাশে, কোম্পানির আমলের একটা ধ্বস্ত বাড়ি। পাছে ভেঙে পড়ে, তাই লোহার পাত বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার সামনে রাস্তা। সেই রাস্তার উপর দিয়ে পিলপিল করে লোক আসছে। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বউ-বাচ্চা নিয়ে সাইকেলে। পুলিশের লোকেরা চটপট একটা কর্ডনের ব্যবস্থা করে ফেলল। কিন্তু ভিড়ের চাপ যেভাবে বাড়ছে, তাতে শুটিং দেখব কী, জনতা-জনার্দনের ধাক্কা খেয়ে না ভূমিশয্যা নিতে হয়। ভানু ঘোষ আর কামু মুখুজ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেও জনস্রোত ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না। বাঁধ এখন যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

তারই মধ্যে আয়োজন চলছে নতুন করে দৃশ্য গ্রহণের। মুহুর্মুহু ধমক বেজে উঠছে, সায়লেন্স্। শব্দ গ্রহণের যন্ত্রের সামনে বসে আছেন নরেন্দ্র সিং। নাউ সায়লেন্স, এভ্‌রিবডি! স্টার্ট সাউন্ড! সয়িদ তাঁর বাক্যের প্রথমাংশ বলে এখন আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছেন। হঠাৎ তারস্বরে একটা বাচ্চা কোথায় কেঁদে উঠল। কাট! সত্যজিৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ''দ্যাট চাইল্ড ইজ ডেঞ্জারাস। ওকে সরাও।''

কিন্তু বাচ্চাটাকে সরালেই বা কি হবে, আলো-ঝলমল আকাশ আবার অন্ধকার। তার মানে কি আজ আর শুটিং হবে না? পুনুবাবু বললেন, ''চিড়িয়াখানার সময়ে কী হয়েছিল জানেন? বৃষ্টির জন্যে হা-পিত্যেশ করে পনেরোটা দিন স্রেফ হাত গুটিয়ে বসেছিলাম। আর এখন দেখুন, উলটো ব্যাপার, সেই বৃষ্টির জন্যই কাজ করা যাচ্ছে না।''

বলতে না বলতে বৃষ্টি নামল। সত্যজিৎ তবু দমলেন না। বললেন, ''সওয়া চারটে পর্যন্ত দেখব।'' তা-ই দেখলেন। তারপর বললেন, ''প্যাক আপ।''

দৌড়ে এসে বাসে উঠলুম। শীতকালে টিপির-টিপির বৃষ্টি, কতক্ষণে থামবে কে জানে। অথচ, অবাক কাণ্ড, বাস খানিকটা এগোতে না এগোতেই আকাশ ফরসা। ''কোন্ খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়''—রবীন্দ্রনাথের এই পঙ্‌ক্তিটাকে পালটে নিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা এই মাঘের দিনে এ কোন্ খ্যাপা শরৎ ছুটে এল? এই বৃষ্টি, এই রোদ্দুর—সত্যি একেবারে শরৎকালের ব্যাপার।

রোদ্দুর যখন উঠেই পড়েছে, তখন আর এই বিকেলবেলায় হোটেলে ফিরে কী হবে? বাস থামিয়ে হজরতগঞ্জে নেমে পড়ি। মিষ্টির দোকানে ঢুকি। দোকানওয়ালা দু-হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, ''আইয়ে, আইয়ে।'' মিষ্টির প্রসঙ্গে আশ্বাস দেয়, ''আপনারা নিশ্চয় বাঙালি? তাহলে, আসুন, একেবারে কলকাত্তার মাফিক রস্‌গুল্লা খাওয়াব।''

আমরা বলি, ''আরে না না, রসগোল্লা খাবার জন্যে লখনউয়ে আসিনি। ওসব খেতে হলে কলকাতায় গিয়ে খাব। আপনারা বরং শাহি টুক্‌রা খাওয়ান।''

দোকানি তা-ই খাওয়ায় বটে, কিন্তু তাঁর রস্‌গুল্লায় যে আমাদের আস্থা নে-ই, এইটে দেখে মর্মাহত হয়। বলে, "বাবুসাব, কাল একবার আসুন, এমন রস্‌গুল্লা খাওয়াব যে, লখনউ থেকে আপনারা আর কলকাত্তায় যেতেই চাইবেন না।"

মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে অন্যসব দোকান দেখে বেড়াই। সাজানো শো-কেসে চোখ রাখি। কিন্তু কিছু কিনি না। আলো জ্বলছে। ভিড় বাড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা হোটেলে ফিরি। ডাইনিং হল-এ ঢুকে যাই। সেখানে রঘুবীর সিংয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। ফোটোগ্রাফার হিসেবে রঘুবীরের খ্যাতি শুধুই স্বদেশে সীমাবদ্ধ নয়, বিদেশেও অতিবিস্তৃত। প্যারিসে থাকেন। কয়েকটা দিনের জন্যে স্বদেশে ফিরেছেন। রাজস্থানের ছবি তুলেছেন প্রচুর! ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সময়ে দিল্লি গিয়েছিলেন। সেখানে খবর পান যে, লখনউয়ে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র শুটিং হবে। "বাস্, চলে এলুম।"

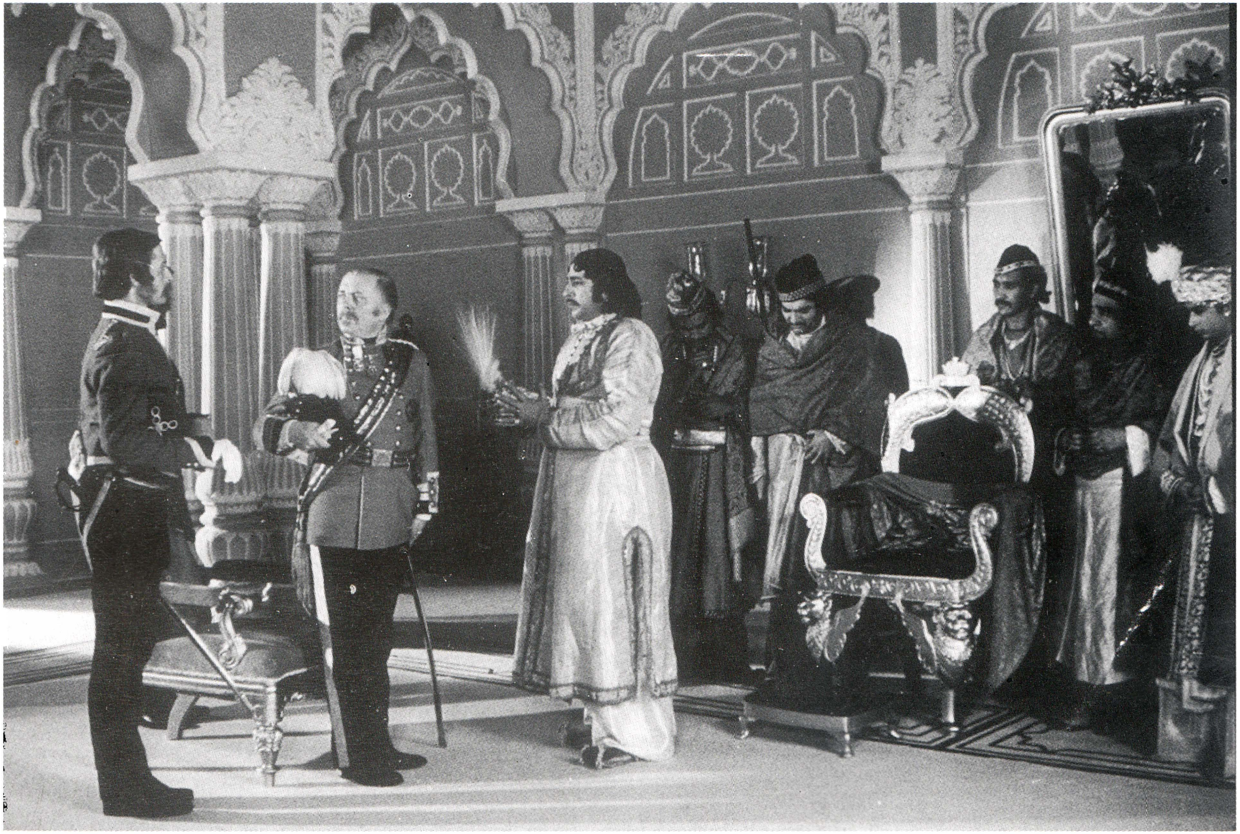
রঘুবীর সিংও এই ক্লার্ক হোটেলেই উঠেছেন। রাজস্থানের ছবিগুলি সত্যজিতের ঘরে দেখানো হয়। অন্ধকার ঘর, দেওয়ালের উপরে একটার পর একটা রঙিন ছবি ভেসে ওঠে। আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি। একটাতে দেখা গেল, গ্রাম্য একজন লোক খামান্‌চা বাজাচ্ছে। দেখেই সত্যজিৎ বলে ওঠেন, "আ, উই নো দ্যাট চ্যাপ। হি ইজ এ ফ্রেনড।" পরের ছবিতে আর একটা লোককে খরতাল (কাঠির বাজনা) বাজাতে দেখা যায়। তাকেও চেনেন সত্যজিৎ। "আরে, সবই যে চেনা মুখ। সক্কলের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল।"

সেটা কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। ছবির সূত্রে একাধিকবার তিনি রাজস্থানে গিয়েছেন। সুতরাং আলাপ তো হতেই পারে। কিন্তু বিস্ময় এইখানে যে, সক্কলকেই তিনি মনে রেখেছেন। কেউই এরা অসাধারণ মানুষ নয়। তবু এদের একজনকেও তিনি ভোলেননি।

ঘরে ফিরতে রাত হয়। সিগারেট ফুরিয়েছে। এত রাতে সিগারেট পাব কোথায়? হোটেল থেকে না বেরিয়ে উপায় নেই। চেষ্টা করে দেখা যাক, কাছে-পিঠে কোনো দোকান হয়তো খোলা থাকতে পারে। একতলায় নামি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। লবি খাঁ-খাঁ করছে। রিসেপশনে

চাবি জমা দিতে গিয়ে আবার সেই রূপসি রমণীকে দেখতে পাই। হজরতমহল। আলবেলার শট্‌কাটিকে আলতো হাতে ওষ্ঠে ধরে চুপচাপ তিনি বসে আছেন।

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, ‘‘স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় চলে যাওনি কেন? কার ভরসায়? তুমি কি জানো যে, আর মাত্র কয়েকটা দিন বাদেই এই লখনউ ছেড়ে তোমাকে নেপালে পালাতে হবে?’’



৬

বিভ্রান্তভাবে মির্জা একবার চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর জিজ্ঞেস করে, ‘‘মির সাহাব, কহাঁ হ্যায় আপকা মসজিদ?’’

সত্যিই তো, কোথায় গেল সেই ধ্বস্ত মসজিদ, যেখানে তারা শতরঞ্জ পেতে বসবে? মিরও কিছু বুঝে উঠতে পারে না। বলে, তাই তো, কোথায় গেল? ‘‘সারা নকশা আঁখো কে সামনে ঘুম রহা হ্যায়। মিম্বর পর ইমলি কা দরখ্...’’

তাহলে? সেই মসজিদ হঠাৎ নিশ্চিহ্ন উধাও হয়ে গেল কী করে? ‘‘কঁহি অংরেজি ফওজ নে আপকা মসজিদকো শহিদ তো নহি কর্ দিয়া?’’

মির বলে, ‘‘খুদা না করে, খুদা না করে।’’

ঠিক এই সময় এসে দেখা দেয় সেই ঈশ্বরপ্রেরিত বালক—কাল্লু।

কিন্তু কাল্লুর আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হাইওয়ে থেকে অতর্কিতে ডাইনে মোড় নিয়ে জমকালো একটা টুরিস্ট বাস আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাসটা দিল্লি যাচ্ছিল। কিন্তু পথের মধ্যেই যখন মস্ত মজার খোঁজ মিলেছে, তখন আর তড়িঘড়ি দিল্লি যাবার দরকার কি!

পিলপিল করে যাত্রী নেমে আসছে। চটপট একটা কর্ডনের ব্যবস্থা করে তাদের ঠেকানো দরকার। গাছ থাকলে তার গুঁড়িতে দড়ি বেঁধে গণ্ডি বানাবার সুবিধে হয়। বানা-মানপুরের

এই ডাঙা জমিতে গাছপালা চোখে পড়ে না। অনিলবাবু তাই দড়ির একটা প্রান্ত নিজেরই কোমরে জড়িয়ে নিয়ে অন্য প্রান্তটা কামু মুখুজ্যের দিকে এগিয়ে দেন। কামুবাবুর কোমরে পাক খেয়ে সেটা ভানুবাবুর দিকে এগিয়ে যায়। ভানুবাবু চেঁচান, হট যাইয়ে! কামু মুখুজ্যে চেঁচান, খবর্দার, খবর্দার। অনিলবাবু কিছু বলেন না, কটিদেশে রজ্জুবন্ধ অবস্থায় স্রেফ একটি খুঁটির মতোই তিনি নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকেন। আমার পাশ থেকে রঘুবীর সিং চাপা গলায় মন্তব্য করেন, "এ পিলার অব স্ট্রেংথ!"

ভিড়ের ধাক্কা খেতে-খেতে আমি পিছিয়ে যাই, তারপর একটা ফণিমনসার ঝোপের পাশে বসে পড়ি। আজ ২৬ জানুয়ারি। কাল রাত্তিরে শুনেছিলাম শুটিং হবে বানা-মানপুর গ্রামে। জায়গাটা লখনউ শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে। তাই সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়া দরকার। সকাল-সকাল মানে কটা? সত্যজিৎ বলেছিলেন, সাড়ে ছটা।

ঠিক সাড়ে ছটায় নীচে নামি। লবিতে সত্যজিতের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলেন, "ইউনিটের বাস পরে আসবে। চলুন আমরা রওনা হয়ে যাই।"

বানা-মানপুর যে কোন্‌দিকে, তা আমি জানতুম না। গাড়ি যখন বড়ো ইমামবড়ার সামনে দিয়ে ডাইনে ঘুরে পুরোনো ব্রিজ পেরিয়ে, হাইওয়েতে পড়ে, তখন নিশানাটা আমার মালুম হয়। শহরের চৌহদ্দি খানিক আগে শেষ হয়েছে। রাস্তাটা এখন ফাঁকা। কোনো পাকা বাড়ি এখন আর আমাদের চোখে পড়ে না। রাস্তার দুপাশে মস্ত-মস্ত গাছের সারি। তার পিছনে শস্যক্ষেত্র। ডানদিকে অবশ্য গাছের সারি আর শস্যক্ষেত্রের মাঝ-বরাবর হাইওয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে একটা রেললাইন চলে গেছে। গাছপালার জানালা দিয়ে পথের উপরে রোদ্দুর এসে পড়েছে। আকাশে মেঘ নেই। সত্যজিৎ বলেন, "গ্লোরিয়াস ডে। কিন্তু এই রোদ্দুরটুকু থাকবে তো?"

কু-ঝিকমিক করতে করতে আমাদের পাশ দিয়ে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন বেরিয়ে যায়। বলি, "দিলখুশাতেও ট্রেনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রিহার্সালের সময় সয়িদ যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন 'শুনা আপ্‌নে', তখন সঞ্জীব তাঁকে ঠাট্টা করে কী বলেছিলেন জানেন?"

"কী?"

সঞ্জীব বলেছিলেন, "রেলগাড়িকা আওয়াজ শুনা হ্যায়।"

সত্যজিৎ হেসে বলেন, "যে সময় নিয়ে এই বই, সদ্য তখন রেলগাড়ির পত্তন হচ্ছে।"

সেই সময়কার ট্রেনের কথা ওঠে। রেলের শতবর্ষ উৎসবের সময়ে হরেক কাগজে যার ছবি ছাপা হয়েছিল। সবই পুরোনো ছবি। সত্যজিৎ বললেন, "চমৎকার ছবি।" কথায়-কথায় মুদ্রণ শিল্পের প্রসঙ্গ ওঠে। সেই সূত্রে ১৮৫৬ সালে ছাপা সেই ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজের কথা। সত্যজিৎ বলেন, "ছাপার ব্যাপারটা পরে অনেক এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছবি ছাপায় যতই উন্নতি হোক, অক্ষর ছাপার কাজ তেমন কিছু এগোয়নি।"

ডানদিকে একটা স্টেশন। বক্‌শিকা তালাও। খানিক আগে দেখা সেই প্যাসেঞ্জার গাড়িটা এখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। লোকজন চোখে পড়ে না। কাঁকরঢালা, নীচু, নির্জন প্ল্যাটফর্ম ফুঁড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ উঠেছে। গাছের নীচে বেঞ্চি। এইরকমের শান্ত ও আত্মনিমগ্ন স্টেশন আমরা স্বপ্নে অনেক সময় দেখে থাকি। কিংবা হয়তো ভাবি যে, এসব শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়। স্টেশন পেরিয়ে, আর খানিক এগিয়ে, আমাদের গাড়ি একটু ধাঁধায় পড়ে যায়। তারপর ডাইনে মোড় নিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় নামে।

বানা-মানপুর গ্রামের এটা বহির্ভাগ। অসাধারণ জায়গা। দুদিকে সবুজ মাঠ। বাঁয়ে ছোলার খেত। সেই খেতের চারপাশ ঘিরে লাগানো হয়েছে মটরশুঁটি। দুটো সবুজ দু-রকম। যেন এক সবুজের জমিন ঘিরে আর-এক সবুজের পাড় বুনে দেওয়া হয়েছে। ডাইনে, একই জমিতে লাগানো হয়েছে গম আর সর্ষে। রাশি-রাশি হলুদ ফুল ফুটে আছে। এমন সতেজ অথচ কোমল হলুদ বর্ণ দেখলে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে। সামনে উঁচু ডাঙা-জমি। উঁচু জায়গাটাকে প্রাগৈতিহাসিক এক সুবিশাল কচ্ছপের পিঠের মতো দেখায়। তার উপরে ইতস্তত কিছু ফণিমনসার ঝোপ। সেখানেও দুটো-চারটে হলুদ ফুল ফুটেছে। বসতি আরও পিছনে। গ্রামের ঘরবাড়ি এখান থেকে দেখা যায় না।

"এ মিঞা সাহাবজাদে..."

ডাক শুনে চমকে যাই। ভিড়ের ধাক্কা থেকে বাঁচবার জন্যে ফণিমনসার ঝোপের ধারে বসে চুপচাপ সিগারেট টানছিলুম। ধড়মড় করে উঠে বসি। কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। জল তুলবার পাম্পের একটানা গুঞ্জন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বাড়ির মধ্যে যেমন নিমেষে একটা বিপুল নৈঃশব্দ্যের সঞ্চার হয়, এও ঠিক তেমনি ব্যাপার। চোখ ফেরাই। কিন্তু সেই ট্যুরিস্ট-বাসটাকে আর দেখতে পাই না। মধ্যপথে নেমে যারা মজা দেখছিল, তারা চলে গেছে। নতুন করে আবার শুটিংয়ের আয়োজন চলছে। কাল্লু এসে উঁচু জমির উপরে দাঁড়িয়েছে। মির তাকে ডাকছে, "এ মিঞা সাহাবজাদে...।" মির্জা বলছে, "আমাঁ শুনো..."

কাল্লুর সঙ্গে আজ সকলেরই আলাপ হয়েছে। বছর দশেক বয়স। আসল নাম সমর্থ নারায়ণ। লখনউয়ের ইস্কুলে পড়ে। বাবার নাম প্রমোদ নারায়ণ। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ। সত্যজিতের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ সম্ভবত কুমার নারায়ণের মাধ্যমে। কবি কুমার নারায়ণের কথা আগেই বলেছি। তিনি এঁদের আত্মীয়। সমর্থ নারায়ণকে দেখামাত্র সত্যজিতের মনে হয় যে, কাল্লুর ভূমিকায় একেই সবচেয়ে ভালো মানাবে। সমর্থর ছোটো বোনকেও দেখলুম। ভারি মিষ্টি মেয়ে। বাবা আর মায়ের সঙ্গে সেও আজকে শুটিং দেখতে এসেছে। তার ইচ্ছে, তাকেও একটু অভিনয় করতে দেওয়া হোক। কিন্তু মুশকিল এই যে, তাকে দেবার মতো কোনো ভূমিকা এ বইয়ে নেই। বেচারা তাই মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বললুম, "দুঃখ কোরো না, এর পরের বইটায় তোমার ডাক পড়বে নিশ্চয়।" শুনে সেই ছোট্ট মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকাল। সম্ভবত বুঝবার চেষ্টা করল, আমি ঠাট্টা করছি কি না। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, "যদি পড়ে তো দেখিয়ে দেব যে, দাদার চেয়ে আমি আরও ভালো অভিনয় করতে পারি।"

তা যদি পারে, তো সেটা যে একটা মস্ত ব্যাপার হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কেন-না, সমর্থ সত্যিই তাক লাগিয়ে দিয়েছে। চলাফেরা আর বাচনভঙ্গি, কোনোটাই কিছুমাত্র আড়ষ্ট নয়, এ ছেলে যে এই প্রথম অভিনয় করতে নেমেছে, বলে না দিলে তা আমি টেরই পেতুম না।

মোটামতন একটা দড়িকে ছড়ির মতন দোলাতে দোলাতে সমর্থ ওই টিলার উপরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর—সামনে হঠাৎ জমকালো জামাকাপড় পরা অচেনা দুজন মানুষকে দেখে—যেভাবে সে একবার থমকে দাঁড়াল, যেভাবে একটা বিস্ময় খেলে গেল তার মুখের উপর দিয়ে, এবং সেই বিস্ময়ের ধাক্কাটাকে কাটিয়ে আবার যেভাবে সে ঠিক আগের মতোই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল, তার পিছনে কি সত্যজিতের তালিম নেই? থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যজিৎ যে চলতি অর্থে কাউকে তালিম দিয়ে তৈরি করেন, তাও হয়তো নয়। অন্তত তেমনটা এখনও আমার চোখে পড়েনি। বরং তার উলটোটাই আমি দেখতে পাচ্ছি। দেখছি, যার ভূমিকার যে তাৎপর্য, সামান্য দু-একটা কথার মধ্য দিয়ে সেটা তিনি এতই সহজ করে তাকে ধরিয়ে দেন যে, সংলাপ কিংবা চলাফেরা কিংবা নিঃশব্দ অভিব্যক্তির টুকরো-টুকরো অংশগুলিকে আর আলাদাভাবে পাখিপড়ানোর মতন মুখস্থ করিয়ে দেবার কোনো দরকারই তাঁর হয় না। জীবনে যে কখনও অভিনয় করেনি, সেও তার ফলে ব্যাপারটাকে খুবই সহজে নিতে পারে। তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। যা তার মধ্যে লুকিয়েছিল এবং যার সম্পর্কে সে নিজে কখনও সচেতন ছিল না, সেই গুপ্ত গুণপনাও খুব স্বাভাবিকভাবেই তখন বাইরে বেরিয়ে আসে। জন্ম নেয় নতুন একজন অভিনেতা।

গমের খেতের সবুজে কখন কালোর ছোঁয়া লেগেছে, টের পাইনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘ জমেছে। সূর্যদেব নিরুদ্দেশ। সত্যজিৎ বললেন, ‘‘নীরেনবাবু আপনার কথার কি হল, রোদ্দুর কোথায়?’’

কী জানি কেন, সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল যে, আজ আর বৃষ্টি হবে না। সত্যজিৎকে বলেওছিলুম, ‘‘দেখবেন, আজ হালকা-হালকা মেঘ থাকবে বটে, কিন্তু রোদ্দুরও থাকবে।’’ এতক্ষণ তা-ই ছিল। হঠাৎ সেই হালকা-মেঘ এমন জমাট হয়ে উঠল কী করে?

মেঘ অবশ্য একটু বাদেই কেটে যায়। কুয়াশা দিয়ে বোনা ফিনফিনে কাপড়ের মতো সেই হালকা মেঘও তখন আর চোখে পড়ে না। আকাশ জুড়ে উলঙ্গ রৌদ্রের খেলা চলতে থাকে।

সত্যজিৎকে বলি, "নিন, বিরিঞ্চিবাবার মতো 'ওঠ্ ওঠ্' করে রোদ্দুর তুলে দিয়েছি। এবারে আপনি খুশি তো?"

সত্যজিৎ বলেন, "মোটেই খুশি নই। এত রোদ্দুরে কাজ হবে না। রোদ্দুর চাই, কিন্তু অল্প-অল্প মেঘও চাই।"

শুনে আমি মুষড়ে পড়ি। "ইশ্ সেকথা আগে বলতে হয়। তাহলে না হয় বড়ো মেঘটাকে তাড়িয়ে দিয়ে ছোটোখাটো মেঘগুলোকে আটকে রাখা যেত।"

এ বেলার মতো শুটিং শেষ। সাড়ে বারোটায় হোটেলে ফিরে আসি। আড়াইটেয় ফের দিলখুশায় যেতে হবে।

আড়াইটের দিলখুশা। বাগানে ঢুকবার পথের ধারে কালকের দেখা সেই ধ্বস্ত বাড়িটা আজও চোখে পড়ে। দিলখুশা প্যালেস। কোম্পানির সাহেবদের হান্টিং লজ। তার পাশ দিয়ে পিলপিল করে লোক চলেছে। খানিক এগোতেই বিশাল জনতা। আজ এখানে শুটিং হবে, এই খবরটা নিশ্চয়ই রটে গিয়েছিল। তার উপরে আজ আবার ছুটির দিন; এবং তারিখটা যেহেতু ছাব্বিশে জানুয়ারি, তাই পুলিশবাহিনী হরেক জায়গায় প্যারেড-মিছিল-সভার কাজে ব্যস্ত রয়েছে, এখানে একজনকেও দেখা গেল না। সত্যজিৎ একদিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। ভিড়ের জন্যে তিনি কি খুব উদ্বিগ্ন? মুখ দেখে তা মনে হয় না। বরং সন্দেহ হয়, তিনি একটু মজাই পাচ্ছেন।

লোক আসছে তো আসছেই। সামান্য যে জায়গাটুকু কর্ডন করে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যেও তারা ঢুকে পড়েছে। একা ভানুবাবু আর কামু মুখুজ্যে এই জনস্রোতকে ঠেকিয়ে রাখবেন? অসম্ভব। সবাই মিলে ভিড় হটানো দরকার। তা-ই হল। ইউনিটের প্রত্যেকে এখন আস্তিন গুটিয়ে লোক সরাচ্ছেন। সত্যজিৎ নিজেও একসময় লোক সরাতে লেগে গেলেন। বেশ কিছু লোক বটগাছে উঠেছে। আরও অনেকে ওঠবার চেষ্টা করছে। সঞ্জীব ও সয়িদ

সেখানে যে যার হাতের তালুতে থুতনি রেখে চুপচাপ বসে আছেন। ডাল ভেঙে লোকগুলো ওঁদের উপরে পড়ে যাবে না তো? দড়ি দিয়ে নতুন করে আবার কর্ডন করা হল। লোকজনকে তার বাইরে ঠেলে দেওয়া হল। নরম মাটিতে আঁচড় কেটে কালকে যে দাবার ছক আঁকা হয়েছিল, ভিড়ের পায়ে-পায়ে তা মুছে গেছে। ''বেঞ্চিটাকে আর একটু পিছনে সরিয়ে দাও।'' ট্রাক পেতে ট্রলি বসানো হল। সঞ্জীব তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে মাটির উপরে ফের কালকের সেই নকশাটাকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন।

সত্যজিৎ গিয়ে ক্যামেরার পিছনে বসলেন। মাথাটা কালো কাপড়ে ঢাকা। পূর্ণেন্দুবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, সাইলেন্স! শান্তিবাবু তাঁর ক্ল্যাপস্টিক দিয়ে নিঃশব্দে এসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন। সয়িদ জাফরি এগিয়ে এসে ক্ল্যাপস্টিকে একবার হাত রাখেন, তারপর মাথা নীচু করে সেই হাত ঠোঁটে ও মাথায় ছোঁয়ান। স্টার্ট সাউন্ড! নরেন্দ্র সিং সঙ্গে-সঙ্গে বলেন, সাউন্ড রানিং। ক্যামেরার পিছন থেকে নির্দেশ আসে, অ্যা-কশন!

আবার একটা বাচ্চা-ছেলে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। কাট্। কান্না থামতে না থামতেই দেখা যায়, কর্ডন ভেঙে একটা গোরু হঠাৎ ভিতরে ঢুকে পড়েছে। সবাই মিলে হৈ-হৈ করে সেটাকে তাড়াতে লেগে যায়। আমার পিছন থেকে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় একজন মহিলা মন্তব্য করেন, ''এই ঢ্যাঙা লোকটার জন্যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।''

আজ সকালে বানা-মানপুরেও জনা তিনেক বাঙালি দর্শক দেখেছি। লখনউয়ের ভিড়ের মধ্যে বঙ্গভাষা শুনে তাই একটুও চমকাই না। পিছন ফিরে নম্র গলায় বলি, ''আমাকে আর ঢ্যাঙা বলে লজ্জা দেবেন না। সত্যিকারের লম্বা মানুষ এখানে মাত্র একজনই। আপাতত তিনি ক্যামেরার পিছনে বসে আছেন।''

আবার একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তিরিশ ইঞ্চি ঘেরের লটপটে বেলবট্স পরিহিত যে যুবকটিকে গণ্ডির বাইরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল, তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ''আরে, আমি তো এখানকার ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের লোক, আমাকে কেন বের করে দিচ্ছেন?''

কামু মুখুজ্যে বলেন, "ও তাই বুঝি? তব্ আইয়ে, আপ্ ভি ভিড় হটাইয়ে।"

পরিত্রাণ পেয়ে বেলবট্‌স তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, "হট্ যাইয়ে। হট্ যাইয়ে।"

গাছ থেকে ফের লোক নামানো হচ্ছে। কয়েকশো সাইকেল এসে ক্যামেরার চোখের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। চটপট সেগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়, ভানুবাবু মারমূর্তি ধরেন। ভিড় পিছিয়ে যায়। কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আসে। শুটিং শুরু হয়। সয়িদ ধীরে ধীরে সঞ্জীবের দিকে এগিয়ে আসেন। ক্যামেরার চোখ তাঁকে অনুসরণ করতে করতে সঞ্জীবের মুখের ওপর এসে এক মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়ায়।

সত্যজিৎ যখন বলেন, 'প্যাক আপ', ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। আকাশে তখনও প্রচুর আলো। কিন্তু আজ আর কাজ হবে না। জনতাকে ফাঁকি দিয়ে সঞ্জীব ও সয়িদকে ইতিমধ্যে বাগান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা গিয়ে ধীরে সুস্থে ইউনিটের বাসে উঠি। হোটেলে ফিরতে-ফিরতে সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়। লবি ফাঁকা। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে হোটেলের লন্-এ মস্ত মজলিশ বসেছে। বিরাট শামিয়ানা। বেলুন উড়ছে। কোর্মা-কারি-পরোটার দোকানে ভিড় জমেছে। একদিকে একটা বেঞ্চ। ঘাগরাপরা একটা মেয়ে সেখানে নাচছে। মুহুর্মুহু হাততালি উঠছে। মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখি। তারপর নিজের ঘরে এসে, হাতমুখ ধুয়ে চা খাই। তারপর আবার হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায়-রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াই। সাতটায় হোটেলে ফিরে নটায় নীচে নামি। গুলফাম-এ ফের সত্যজিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

"কেমন লাগছে?"

বলি, "দারুণ। কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল। আমাদের ইনটেলেকচুয়ালদের কারও-কারও ধারণা, বর্তমান কালের সমস্যাকে আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। তা নইলে নাকি ছবির জন্যে এই নবাবি আমলের গল্প আপনি বেছে নিতেন না। কিন্তু এ গল্পের মধ্যে যে একটা মস্ত অসুখের ইঙ্গিত রয়েছে, আজকের এই উনিশশো সাতাত্তরের পটভূমিকায় কী সেটা আরও প্রাসঙ্গিক নয়?"

সত্যজিৎ বলেন, "অসুখটা কি, আপনি সেটা ধরতে পেরেছেন?"

"নন ইনভল্‌ভমেন্ট। প্রেম চন্দের গল্প পড়ে অন্তত সেইরকমই আমার মনে হয়েছিল। তারপর আপনার স্ক্রিপ্‌ট পড়লুম। দেখলুম স্ক্রিপ্‌টে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে।"

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকেন সত্যজিৎ। তারপর বলেন, 'ইউ আর অ্যাব্‌সলুট্‌লি রাইট।"

সাত

আমি ঘুমোই একটু দেরিতে। তাই বলে যে দেরিতে উঠি, তা নয়। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু ভোরবেলায় যে উঠতেই হবে, এইরকমের একটা বাধ্যবাধকতা থাকলে রাতটা বড়ো উদ্বেগে কাটে, ঘুম একেবারে হতেই চায় না। তারপর, সারারাত এপাশ ওপাশ করতে করতে শেষ রাত্তিরে এমন ভয়ংকর রকম ঘুমিয়ে পড়ি যে, আটটা-নটায় ঘুম ভাঙে। রাত্তিরে তাই ওয়েক-কলের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলুম। ভোর পাঁচটায় টেলিফোন বেজে ওঠে। ছটার মধ্যে তৈরি হয়ে নীচে নামতে তাই কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু এত সকালে না নামলেও চলত। ইউনিটের বাস এখনও আসেনি। সাড়ে ছটায় সত্যজিৎ বলেন, "বাসের জন্যে বসে থাকবেন না, আমার সঙ্গে চলে আসুন।" পিছনে-পিছনে আরও একটা গাড়ি রাস্তায় এসে নামে। চটপট ইত্ৰবাগে পৌঁছে যাই। সূর্যদেব যেন আমাদের প্রতীক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। দিগন্তের অন্তরাল থেকে মুখ বাড়িয়ে এবারে সহাস্য তিনি জিজ্ঞেস করেন, ভালো আছ? লখনউয়ের ঘুম এখনও ভালো করে ভাঙেনি। টিলার ঘাস এখনও ভিজে। সেই ভিজে ঘাস মাড়িয়ে আমরা উপরে উঠে যাই। জাভেদ সিদ্দিকি বলেন, "সারা রাত ওস্ পড়েছে"।

সত্যজিৎ আরও সামনে এগিয়ে যান। তাঁকে ভারি ব্যস্ত দেখায়। টিলার উপরে এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন, স্থির হয়ে কোথাও একটু দাঁড়াচ্ছেন না। খুব সম্ভব একটা প্ল্যান

ছকে নিচ্ছেন যে, কাজগুলোকে পরপর কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। হঠাৎ খানিকটা পিছিয়ে এসে ইমামবড়ার দিকে চোখ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। নির্দেশ দিলেন, ক্যামেরাটাকে ঠিক কোথায় বসাতে হবে। ক্যামেরা বসানো হল। ইমামবড়ার উপরে প্রথম সূর্যের আলো পড়েছে। আর একবার সেদিকে চোখ রেখেই সত্যজিৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। নীচের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে কাকে বললেন, একটা টুল নিয়ে আয়। টুল এল। ক্যামেরায় চোখ রেখে বিড়বিড় করছেন, ''পারফেক্ট আসছে ...পারফেক্ট!'' পরমুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে ''ঘাসের উপরে আমাদের পায়ের ছাপ কীভাবে ফুটেছে দেখুন।'' বলেই আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, ''সুরেশ বলেছিল আর্টিস্টরা রেডি। কোথায় তাঁরা?''

বলতে না বলতে সঞ্জীবকুমার ও সয়িদের গাড়ি এসে যায়। টিলার উপর থেকে সত্যজিৎ বলেন, ''কাম অন... কাম অন... কুইক!''

মির্জা ও মির বড়ো ইমামবড়ার দিক থেকে টিলার উপরে উঠে আসছে। ক্যামেরার চোখ ঘুরে যাচ্ছে। ''কাট... ফাইন... লাভ্‌লি!''

শটটা তোলা হতেই আমরা নীচে নেমে আসি। পাশেই পুরোনো ব্রিজ। আমরা সেই ব্রিজের দিকে এগোই। ব্রিজের দুদিকে ঝটপট লোক মোতায়েন করে গাড়িঘোড়া ও পথচারীদের আটকে রাখবার ব্যবস্থা হয়। সূর্য উঠছে। মসজিদ পিছনে রেখে মির ও মির্জা ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। ''কাট্‌... ফাইন! বাট আই শ্যাল টেক ওয়ান মোর। কাট... ফাইন... প্রিন্ট্‌।''

ব্রিজ থেকে ঝুঁকে জলের দিকে তাকাই। গোমতীর গা থেকে হালকা কুয়াশার ওড়না এখনও খসে পড়েনি। নদীর ধারে মস্ত মস্ত পাথর চোখে পড়ে। এত সকালেও দু-চারজন স্নানার্থী দেখতে পাই। একটি মেয়ে পাথরে আছাড় মেরে কাপড় কাচছে। বুকজলে দাঁড়িয়ে একজন মোটামতন লোক তার পৈতেটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। লোকটা কিন্তু ডুব দিল না। নদীর মধ্যে দাঁড়িয়েও একটা লোটায় করে জল তুলে মাথায় ঢালতে লাগল। আরও

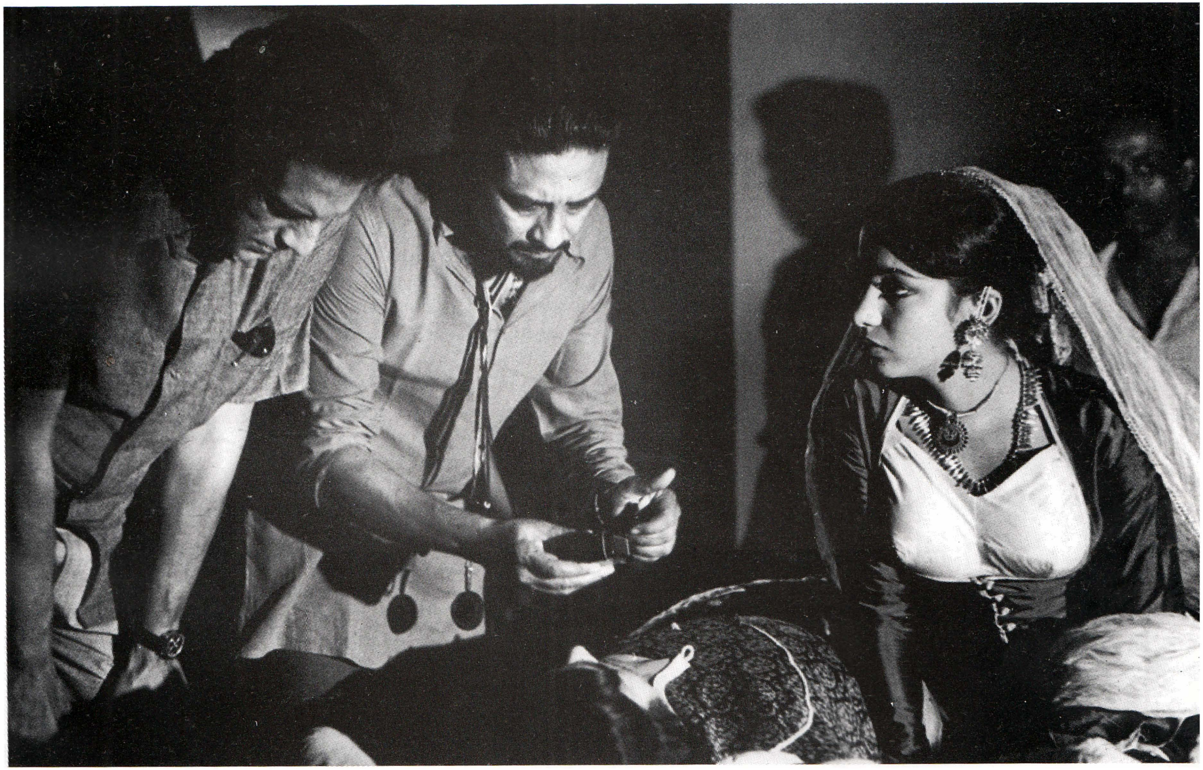
খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখতে ইচ্ছে করে। জায়গাটা এতই মনোরম যে, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু সময় কই। ইউনিটের বাস এসে গেছে। ঘনঘন হর্ন দিচ্ছে। খানিক দাঁড়িয়েই বাসে উঠতে হয়। লখনউ ছাড়িয়ে আমরা গাঁয়ের দিকে রওনা হয়ে যাই। বানা-মানপুরে পৌঁছতে আটটা বাজে।

আকাশের সেই মলিন ভাবটা ইতিমধ্যে কেটে গেছে। মেঘ যে একেবারেই নেই, তা অবশ্য নয়। এখানে ওখানে ছেঁড়া-ছেঁড়া দু-চারটে মেঘ আজও চোখে পড়ে। কিন্তু আকাশের বুকে যে-যার জায়গায় এমন শান্ত হয়ে তারা সেঁটে আছে, সবটা মিলিয়ে ভারি নম্র একখানা ছবির মতো দেখায়।

সঞ্জীবকুমার ও সয়িদ জাফরির সামনে একটা নেড়ি কুত্তা ঘুরঘুর করছে। সয়িদ সেটাকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করেন। তারপর সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে খুবই গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, ''উইল দিস কুত্তা বি ইন দি শট্?'' ইউনিটের লোকেরা কুকুরটিকে তক্ষুনি তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাড়িয়ে না দিলেও কিছু ক্ষতি ছিল না। এক যুগের মানুষকে যে অন্য যুগে বেখাপ্পা ঠেকে, তার কারণ তো আর কিছুই নয়, তার পোশাক। কুকুর-বেড়ালের পোশাকের বালাই নেই। ফলে, বিশ শতকের এই নেড়ি কুত্তাটিকে এই নবাবি আমলের ছবির মধ্যে অক্লেশে রাখা যেত।

নাকি গত শতকের প্রেমিকরা তাতে ক্ষুব্ধ হতেন? এমন মানুষ আকছার চোখে পড়ে, যাঁদের বিশ্বাস, গোরুর দুধ সেকালে আরও মিষ্টি ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, গাছপালা আরও সবুজ। *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*-তে অকস্মাৎ একটি ঘৃতভর্জিত নীরোম সারমেয় দেখলে তাঁরা হয়তো আঁতকে উঠে মন্তব্য করতেন যে, ইতিহাসের এখানে ঘোর বিকৃতি ঘটেছে, কেন-না, সেই স্বর্ণযুগের সারমেয়কুলও ছিল সর্বৈব সুদর্শন। হায়, অতীতের সমস্ত যুগই তাঁদের কাছে 'স্বর্ণযুগ'।

রঘুবীর সিংকে আজ একটু চঞ্চল দেখায়। সেটা স্বাভাবিক। তাঁর আজ চলে যাবার কথা।



অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করেন, "আপনাদের কাগজ থেকে কোনো ফোটোগ্রাফার আসছেন না?"

বলি, "সম্ভবত আসবেন। তবে ঊনতিরিশ তারিখের আগে নয়।"

শুনে তিনি অবাক হয়ে যান। "সে কী। এটা তো লিপ ইয়ার নয়। তাহলে এই ফেব্রুয়ারি মাসে আবার ঊনতিরিশ তারিখ কোথায় পাচ্ছেন?"

আরও অবাক হয়ে আমি বলি, "এটা লিপ ইয়ার নয় ঠিকই, কিন্তু এটা ফেব্রুয়ারিও নয়। এটা জানুয়ারি মাস।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

রঘুবীর একেবারে হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একগাল হেসে বলেন, "তাহলে আমি আজ যাব না। এত ঘোরাঘুরি করতে হয় যে, মাসটা কী, তাও মনে থাকে না।"

আমি বলি, "এই তো সবে শুরু। এর পরে বছরটা কী, তাও ভুলে যাবেন!"

রঘুবীর সিং প্যারিসে ঘর বেঁধেছেন। লন্ডনেই বাঁধতেন। কিন্তু হিথরো এয়ারপোর্টে ভারতীয় ঝাড়ুদার দেখে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। চটপট তিনি সিদ্ধান্ত পালটে ফেলেন। "আরে দূর দূর, ঝাড়ুই যদি দিবি, তবে আর মরতে লন্ডনে গিয়েছিস কেন? এদেশে কি ঝাড়ুদারের কাজটাও জুটত না নাকি?"

ভিড় বাড়ছে। তাদের ঠেকিয়ে রেখে আজ বিস্তর শট নেওয়া হয়। উঁচু জমিটার দিকে আঙুল তুলে সত্যজিৎ বলেন, "এই টিলাটা থাকায় বড্ড ভালো হয়েছে।"

ঊনতিরিশ তারিখে কলকাতায় ফিরব। হোটেলে ফিরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের অফিসে যাই। ফ্লাইট কনফার্ম করি। ক্লান্ত লাগছে। একটু গড়িয়ে নিলে হত। দেড়টায় ফের নীচে নামতে হবে।

ঠিক দেড়টায় নীচে নামি, এবং ধাঁধায় পড়ে যাই। হোটেলবাড়ির সামনে বাস একটা দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু সাংবাদিক কিংবা ফোটোগ্রাফারদের কাউকেই তার মধ্যে দেখি না। তাঁদের জন্য কি অন্য বাহনের ব্যবস্থা হল? ইউনিটের একজন কর্মকর্তাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করি, ব্যাপার কি? তিনি হাত উলটে বলেন বাসে আজ ইউনিটের লোকদেরই জায়গা হওয়া শক্ত।

কেন? না জনা-চল্লিশেক এক্স্ট্রা আছে। ''আগে তাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে না?'' ভদ্রলোক খুব নিরীহ ভঙ্গিতে আমার সামনে এই প্রশ্নটাকে এগিয়ে দিয়েই উধাও হয়ে গেলেন। কীসের এক্স্ট্রা, কেন এক্স্ট্রা, কিছুই আমার বোধগম্য হল না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে, এখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

শুনেছি আজ মুরগা লড়াইয়ের ছবি তোলা হবে। কিন্তু লড়াইটা যে কোথায় হবে, তা আমি জানি না। এই অবস্থায় ট্যাক্সি নিয়েই বা কী হবে? সন্দীপ ইতিমধ্যে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে বলল, ''বাসে জায়গা হবে না তো ভারি বয়েই গেল। আসুন অন্য কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করা যাক।'' বলতে না বলতে দেখতে পাই যে, প্রযোজকের গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সন্দীপ চটপট হাত বাড়িয়ে গাড়িটাকে আটকে দেয়, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ''উঠে পড়ুন।''

সুরেশ জিন্দল হতভম্ব হয়ে বলেন, ''কোথায় যাবেন আপনারা?''

সন্দীপ বলে, ''কোম্পানিবাগে।''

''কিন্তু আমি যে অন্য জায়গায় যাচ্ছি।''

''বেশ তো, আগে আমাদের কোম্পানিবাগে নামিয়ে দিন। তারপর সেখানে যাবেন।''

সুরেশ আর কথা বাড়ান না। সম্ভবত বুঝতে পারেন যে, আমাদের হাত থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। গাড়ি ডাইনে মোড় নেয়। তারপর খানিক এগিয়ে বাঁয়ে ঘোরে। কোম্পানিবাগের হাতায় আমাদের নামিয়ে দিয়ে সুরেশ আবার ফিরে যান। গাড়ি থেকে

নেমে বুঝতে পারি যে অর্ধচন্দ্রাকার এই জায়গাটা আসলে ইমামবড়ার পিছনে। রাস্তার পাশে ঘাসজমি। সেই জমি খানিকটা এগিয়ে তারপর হঠাৎ অনেকটা উঁচু হয়ে উঠেছে। উঁচু জায়গাটার ওদিকে কোম্পানিবাগ। বড়ো বড়ো গাছের সারি চোখে পড়ে। এদিকে, নীচু জমিতে, কর্দমলিপ্ত গোটাকয়েক স্বাস্থ্যবান মোষ ও অগুন্তি শুয়োর চরে বেড়াচ্ছে। শুয়োরগুলো মাটি শুঁকতে-শুঁকতে ঘোঁতঘোঁত করে বিরক্তি প্রকাশ করে। মোষগুলো নিঃশব্দে ঘাস খেয়ে যায়।

রাস্তার অন্যদিকে পাশাপাশি কয়েকটা ঝোপড়ি। তার মধ্যে চায়ের দোকান। যাক, চায়ের ব্যবস্থা হল। দোকানের সামনে নড়বড়ে একটি বেঞ্চি পাতা। বেঞ্চিতে বসে আমরা চা খাই। সিগারেট কিনি। মিনিট পনেরো কেটে যায়। কিন্তু ইউনিটের লোকজন আমাদের চোখে পড়ে না। কোথায় গেলেন তাঁরা? কোম্পানিবাগে যেতে হলে তো এই পথ দিয়েই যেতে হবে।

হঠাৎ একটা গাড়ি দেখতে পাই। একটু কাছে আসতে নম্বর দেখে বুঝতে পারি যে, সেটা সত্যজিতের গাড়ি। গাড়িটা কিন্তু আমাদের দিকে আর না এগিয়ে, অতর্কিতে বাঁয়ে মোড় নিয়ে, ইমামবড়ার ঠিক পিছনের চত্বরের দিকে চলে যায়। সন্দীপ বলে, "নিশ্চয় লোকেশন পালটানো হয়েছে।"

ঠিক তা-ই। বড়ো ইমামবড়ার সংলগ্ন জমিতেই মুরগির লড়াই হবে। ভারি সুন্দর জায়গা। অনেকখানি ফাঁকা জমি। তার একদিকে মস্ত একটা গড়খাই, অন্যদিকে ইমামবড়ার পিছনের অংশ। ইমামবড়ার এ দিকটা এখনও সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে। পলেস্তারা কোথাও খসেনি। নকশাগুলোও নষ্ট হয়নি। গড়খাইয়ের উপরে একটা ব্রিজ। সেই ব্রিজ পেরিয়ে এদিকে আসতে হয়। জমি যেখানে ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে, সেইখানে—আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে—দাঁড়িয়ে আছে অতিশয় আলুথালু চেহারার মস্ত কয়েকটি বাবলাগাছ।

বাবলার বাহার খোলে চাঁদনির রাতে। পাতা তো বড়ো নয়, তাই জ্যোৎস্নাধারাকে

আটকে রাখতে পারে না; মনে হয় যেন অনেকখানি জায়গাজোড়া বিশাল একটা ঝাঁঝরির ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে। এখন দুপুর, তাই জ্যোৎস্নার বদলে ঝরছে রৌদ্রধারা—বাবলাগাছের তলায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে পাতাগুলো আর একটু বড়ো হলেই ছিল ভালো। জানুয়ারি মাস, রোদ্দুর তো খারাপ লাগবার কথা নয়, কিন্তু পরপর কয়েকটা দিন বৃষ্টিবাদলা হবার পরে আজ এতই কড়া রকমের রোদ্দুর উঠেছে যে, মাথা ধরবার জোগাড়। কামু মুখুজ্যে এগিয়ে এসে সত্যজিৎকে বলেন, ‘‘রোদ্দুরে কষ্ট হবে, এটা পরে নিন।’’ বলে নিজের মাথার টুপিটা সত্যজিতের দিকে এগিয়ে দেন। বারান্দাওয়ালা সাদা টুপি, আজকাল যেগুলো ক্রিকেটের মাঠে খুব দেখা যায়। সত্যজিৎ সেটা হাতে নিয়ে হাসেন।

ইমামবড়ার পিছনের বারান্দায় ভিড় জমে গেছে। নীচের জমি থেকে জায়গাটা বেশ উঁচু। রঘুবীর সিং, নিমাই ঘোষ ও সন্দীপ সেখানে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ঝটপট কয়েকটা স্টিল তুলে নেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি অল্পবয়সি বাঙালি ছেলে হরেকরকমের চালাক চালাক মন্তব্য করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। তাতে সুবিধে না হওয়ায় গলা বাড়িয়ে অকস্মাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ‘‘কী বই হচ্ছে সত্যজিৎদা?’’ সত্যজিৎ তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে জবাব দেন, ‘‘পরে জানতে পারবে ভাই।’’

শ্রীমতী প্রভা পাওয়ারের সঙ্গে আলাপ হল। শান্তিনিকেতনে কলাভবানের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর স্বামী শ্রীঅবতারসিং পাওয়ারও এককালে সেখানে শিল্পশিক্ষার পাঠ নিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এখন লখনউ আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। পাওয়ারদম্পতির শখ হচ্ছে হরেকরকমের জীবজন্তু পোষা। বাড়িতে নাকি কুকুর-বেড়াল-পায়রা-মুরগির ছড়াছড়ি। লড়াইয়ের মোরগ তাঁরাই দিচ্ছেন।

খানিকবাদেই বিশাল একজোড়া মোরগ এসে গেল। মাথায় মস্ত ঝুঁটি; চক্ষু দুটি ঘূর্ণমান। ঘনঘন ডানা ঝাপটাচ্ছে আর যুদ্ধের ডাক ছাড়ছে। জুম ক্যামেরা বসানো হল। অনিলবাবু রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, ‘‘এক্স্ট্রারা এসে গেছে।’’

এক্‌স্ট্রার ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলুম। ইউনিটের বাস গড়খাইয়ের ধারে এসে থামতেই তার থেকে পিলপিল করে জনা-চল্লিশেক লোক নেমে এল। পরনে লখনউয়ের পুরোনো ধাঁচের পোশাক। গত শতকের আবহ ফোটাবার জন্যই এই সেকেলে পোশাকের ব্যবস্থা। শুনলুম, এরাই এবারে মোরগা লড়াবে।

৮

যাঁরা বলেন যে, অযোধ্যার নবাবরা শুধু ফুর্তি করেই দিন কাটিয়েছেন, কেউ কখনও যুদ্ধবিগ্রহ করেননি, তাঁরা আসলে চোদ্দো আনা সত্যি কথা বলেন। পুরো সত্যিটা এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁদের দাপট এককালে নেহাত কম ছিল না, কিন্তু পরবর্তী কালে সেই ধারাটা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। এই নবাববংশের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই বুরহান-উল্-মুল্ক আমিনউদ্দিন খাঁ নাশাপুর ছিলেন একজন জবরদস্ত লড়াকু মানুষ। দিল্লির বাদশাহি দরবার ১৭৩২-এ তাঁকে অযোধ্যার সুবেদার করে পাঠান। কিন্তু তাতেই যে তাঁর পথ একেবারে নিষ্কণ্টক হয়ে গিয়েছিল, তা নয়। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে যিনি লখনউয়ের জায়গির লাভ করেছিলেন, সেই শেখ আবদুর রহিমের বংশধরদের পরাক্রম তখনও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাঁদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে তবেই বুরহান্-উল্-মুল্ক তাঁর প্রভুত্বকে পাকা করতে পারেন। তিনি অবশ্য বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। নাদির শাহ যখন ভারত আক্রমণ করেন, দিল্লির বাদশার তলব পেয়ে বুরহান-উল্-মুল্ককে তখন দিল্লি যেতে হয়। সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেননি। দিল্লিতে যখন লুঠপাট চলছে, তখন সেইখানেই তিনি নিহত হয়েছিলেন। পরবর্তী নবাব সফদরজঙ্গকেও লড়তে হয়েছিল। পাঠানদের সঙ্গে সেই লড়াইয়ে তিনি অবশ্য জিততে পারেননি, তবে সেই পরাজয়ের শোধ তুলেছিলেন তাঁর পুত্র শুজাউদ্দৌলা।

শুজাউদ্দৌলার জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য লড়াইটা ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। তাতে তিনি হেরে যান। কিন্তু শুধু বকসারের সেই পরাজয় (১৭৬৪) দিয়ে শুজাউদ্দৌলাকে বিচার করাটা বোধহয় ঠিক হবে না। বরং বলা ভালো যে, সেই পরাজয় তাঁকে আরও শক্ত করে গড়ে তুলেছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর কখনও তিনি সম্মুখ সমরে নামেননি বটে, কিন্তু নড়বড়ে একদল সৈন্য নিয়ে যে যুদ্ধ জেতা যায় না, এইটে বুঝে গিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীর একেবারে আদ্যন্ত সংস্কার করে ছেড়েছিলেন। নইলে বকসারের যুদ্ধের কয়েক বছর বাদে মারাঠাদের হারিয়ে এটাওয়া কেড়ে নেওয়া কিংবা পাঠান যোদ্ধা হাফিজ রহমত খাঁ-কে হারিয়ে বেরিলি দখল করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

ওইখানেই অবশ্য পূর্ণচ্ছেদ। ১৭৭৪(?)-এ শুজাউদ্দৌলার মৃত্যু এবং ১৮৫৬-তে ওয়াজিদ আলি শাহের লখনউ ত্যাগ, লখনউয়ের ইতিহাসের এই যে দুটি মস্ত ঘটনা, এর মধ্যবর্তী সময়ে মোট নজন নবাব অযোধ্যার রাজতখ্‌তে বসেছেন বটে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ বিরাশি বছরের মধ্যে সেই নয় নবাবের একজনকেও নিরাপদ জীবনযাত্রার মোহ কাটিয়ে যুদ্ধের পথে পা বাড়াতে দেখা যায়নি। তাঁদের কেউ-বা ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কেউ-বা দানশীল, কেউ-বা বাস্তুবিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন, কেউ-বা নৃত্যগীতে, কেউ-বা শৌখিনতার চর্চায় পারঙ্গম ছিলেন, কেউ বা রমণীচর্চায়। কিন্তু, হায়, অস্ত্রধারণের উদ্যম তাঁদের একজনেরও ছিল না। "শুজাউদ্দৌলার ফৌজি বন্দুকের মোকাবিলা করবার ক্ষমতা ইংরেজ সেনার ছিল না",—মুনশি ফ্যায়জবক্‌শের এই মন্তব্য হয়তো মিথ্যে নয়, কিন্তু শুজাউদ্দৌলার পরবর্তী কালের অযোধ্যা যে বন্দুক ধারণের উৎসাহ সম্পূর্ণ হারিয়েছিল, সেটাই আরও মর্মান্তিক রকমের সত্য কথা।

উপরন্তু যুদ্ধে যাঁদের মতি ছিল না, প্রশাসনেও তাঁরা ছিলেন নিতান্ত অপটু। (কে কটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন, কিংবা কে কটা বাজার বসিয়েছিলেন, শুধু তাই দিয়ে নিশ্চয় প্রশাসনিক নৈপুণ্যের বিচার চলে না।) বস্তুত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের

‘লেভেলার’ বলা হত, প্রশাসনের ব্যাপারে লখনউয়ের নবাবদের অযোগ্যতাকে একটা অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে তবেই তাঁরা—চুক্তিভঙ্গে জেনারেল উট্রামের আত্যন্তিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও—অযোধ্যাকে পুরোপুরি কুক্ষিগত করবার চক্রান্তটাকে পাকা করে তুলতে পেরেছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাসকার কে (Kaye) বলেছেন যে, ভারতবর্ষের তৎকালিক ইংরেজ রাজনীতিকরা যেন দেশীয় রাজন্যবর্গকে “একেবারে সহ্যই করতে পারছিলেন না।” সেই সময়কার ইতিহাস নিয়ে অন্যান্য যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁদের উক্তিতেও কে-র এই মন্তব্যের সমর্থন মেলে। বস্তুত তাঁদেরই একজন (ফিলিপ ম্যাসন) আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কে-র কথাটা সকলের সম্পর্কে সত্য হোক আর না-ই হোক, লেভেলারগোষ্ঠীর সম্পর্কে একেবারে ষোলোআনা সত্য। তা-ই যদি হয়, তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ইংরেজদের তরফে তখন যে জালবিস্তার করা হচ্ছিল, প্রশাসনিক ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি যোগ্যতার পরিচয় দিলেও ওয়াজিদ আলি শাহ্ তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারতেন না। কিন্তু সেটা পরের কথা। আপাতত এই অপ্রিয় সত্যটা স্বীকার্য যে, কণামাত্র প্রশাসনিক যোগ্যতারও তিনি পরিচয় দিতে পারেননি, এবং তারই ফলে ইংরেজদের চক্রান্ত অত্যন্ত সহজে সফল হয়।

পূর্বি দরবারের জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। কিন্তু তার ভেতরটা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়। কিন্তু বিলাস-ব্যসনে যাঁরা আকণ্ঠ ডুবেছিলেন, তেমন কোনো ঝুঁকি নেবার স্পৃহাই তাঁদের ছিল না। নইলে কি আর সিংহাসনে বসবার পরে নবাব সাদত আলি খাঁ তাঁর রাজত্বের অর্ধাংশ একেবারে বিনাবাক্যে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতেন? এ হল অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিককার কথা। আর ১৮৫৬-তে অযোধ্যার বাকি অর্ধাংশও ইংরেজদের হাতে এসে গেল। তার এক বছর বাদে লখনউয়ের হাতে আবার অস্ত্র ঝলসে ওঠে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, শুজাউদ্দৌলা-র পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের এই পূর্বি দরবারের নবাবরা

যেক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে শুধু ইংরেজদের মৈত্রীই প্রার্থনা করেছেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কৃপার উপরে নির্ভর করে জীবনধারণে অভ্যস্ত হয়েছেন, সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে একজন বেগম সেক্ষেত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি হজরতমহল; লখনউ-ত্যাগী ওয়াজিদ আলি শাহ্-এর নাবালক পুত্র মির্জা বিরজিস কদ্রুর জননী। এলাহাবাদ আর ফৈজাবাদের বিদ্রোহী সিপাহিরা যখন লখনউয়ে এসে পৌঁছয়, সেই প্রবল উত্থানের অভিঘাতে তখন স্থানীয় জনসাধারণেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়। দশ বছরের নবাবজাদাকে তারা সিংহাসনে বসিয়ে দিল, এবং তার মুখ্‌তার হিসেবে হজরতমহল রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

ভাবতে অবাক লাগে যে, কলকাতার মেটিয়াবুরুজে আশ্রয় নিয়ে, এবং ইংরেজদের দেওয়া মাসোহারার উপরে নির্ভর করে ওয়াজিদ আলি শাহ্ যখন নতুন করে আবার তাঁর নৃত্যগীতের আসর বসাচ্ছিলেন, তাঁর বেগম তখন বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। হজরতমহলের বিদ্রোহ অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ছ-সাত মাস বাদে ইংরেজরা যখন পুনশ্চ এসে লখনউয়ে ঢোকে, নাবালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তখন নেপালের দিকে সরে যান। তবু সন্দেহ নেই যে, লখনউয়ের ইতিহাসের সমস্ত বিলাস, সমস্ত বৈভবকে ম্লান করে দিয়ে ওই কয়েকটা মাত্র মাসের সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টাই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।

লখনউয়ের নবাবরা যে পারতপক্ষে যুদ্ধের পথে পা বাড়াননি, তার কারণ অবশ্যই এই নয় যে, হিংসায় অথবা রক্তপাতে তাঁদের রুচি ছিল না। আসলে, সেই দরবার তখন ঘোরতর অবক্ষয়ের দ্বারা গ্রস্ত, এবং সেই অবক্ষয়ই সেদিন অন্যবিধ হিংসা আর রক্তপাতের দিকে তাকে ঠেলে দেয়। বস্তুত যদি বলি যে, আপন শরীরের রক্ত ঝরিয়ে যাঁরা নিজেরা কখনও লড়েননি, জঙ্গল-থেকে-ধরে-আনা অথবা গৃহপালিত নানাবিধ জীবজন্তুকে পরস্পরের সঙ্গে লড়িয়ে দিয়ে একটা রক্তময় দৃশ্য রচনা করাই লখনউয়ের সেই নবাবকুলের সবচেয়ে প্রিয়

ব্যসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাহলে নিশ্চয় অতিশয়োক্তির অপরাধ হবে না। তাঁরা বাঘের সঙ্গে বাঘ লড়াতেন, চিতার সঙ্গে চিতা। হাতি, গণ্ডার, উট, হরিণ আর ভেড়ার মতো নিরামিষাশী প্রাণীরাও তাঁদের তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। শাহ্ মঞ্জিলের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে তাঁরা দেখতেন যে, বাঘের থাবায় বাঘের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, এবং হরিণের শৃঙ্গের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে অন্য হরিণের শরীর। সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের পশুদেরও পরস্পরের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া হত বইকি। মত্ত হাতির পায়ের তলায় বাঘের শরীর পিষ্ট হত, গণ্ডারের শৃঙ্গে বিদীর্ণ হত কালোচিতার উদরদেশ। মোসাহেবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নবাবরা সেই দৃশ্য দেখতেন, প্রভূত আনন্দ পেতেন, এবং সম্ভবত মনে করতেন যে, এই ধরনের রক্তক্ষয়ী 'খেলা'-র আয়োজন করাটাই হচ্ছে মস্ত পৌরুষের ব্যাপার।

নিষ্ঠুরতার এই যে রাজকীয়চর্চা, আবদুল হালিম এর সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত, তিনিও মন্তব্য করতে ছাড়েননি যে, 'অর্থহীন ও ক্রূরতাপূর্ণ'। এই কুরুচিবিলাস শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা নিজেরা কোনো বীরত্বপূর্ণ কাজ করে না। হালিমের এই মন্তব্য আদৌ অকারণ নয়, লখনউয়ের নবাবদের চরিত্রবিচারে তাঁর কোনো ভুল হয়নি। তিনি খুব স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, সত্যকারের বীরত্বপূর্ণ কোনো কাজের প্রতি যদি লখনউয়ের এই ভোগী ও বিলাসী নবাবদের কিছুমাত্র আগ্রহ থাকত, তাহলে তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণ করতেন এবং নিজেদের শরীর থেকে কিছু রক্ত ঝরাতেন; বন্দি পশুদের রক্ত ঝরাবার খেলায় এইভাবে মত্ত হতেন না। নবাবি বিলাস-বৈভবের বর্ণচ্ছটা কি আবদুল হালিমের দৃষ্টিকেও স্বপ্নিল করে তোলেনি? করেছিল অবশ্যই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ-খেলা বীরের খেলা নয়; এর মধ্যে শুধু নিপাট নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এবং সর্বরকম নিষ্ঠুরতার মতোই—এই নিষ্ঠুরতাও আসলে ভীরুতার গর্ভেই জন্ম নিয়েছিল।

রাজার ব্যসন প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না। এক্ষেত্রেও হয়নি। নবাবরা যার সূচনা করেছিলেন, লখনউয়ের প্রজাপুঞ্জকেও সেই নিষ্ঠুর খেলা মাতিয়ে তুলেছিল।

সাধারণ মানুষরা কি আর বাঘ-ভাল্লুক লড়াত? তারা লড়াত মোরগ আর ভেড়া। সেই সঙ্গে তিতির, বটের, লবা, বুলবুল, লাল কবুতর আর তোতার লড়াইও নাকি রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। লড়ুয়ে ভেড়া কিংবা পাখি তৈরি করতে পারাটা একটা মস্ত বাহাদুরির ব্যাপার বলে গণ্য হত। যারা ভেড়া কিংবা পাখি লড়াইয়ের ব্যাপারে যত ওস্তাদি দেখাতে পারত, তার তত খাতির।

অন্যান্য পাখির তুলনায় মোরগের লড়াই যে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তার তিনটি কারণ। প্রথমত, মোরগই সবচেয়ে সহজলভ্য প্রাণী। দ্বিতীয়ত, লড়াইয়ের কায়দা-কৌশল মোরগকে শেখানো যত সহজ, অন্যান্য পাখিকে শেখানো তত সহজ নয়। তৃতীয়ত, মোরগ যেমন দাপটের সঙ্গে লড়ে, আর কোনো পাখি তেমন লড়ে না। অন্যান্য পাখি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চঞ্চু কিংবা নখরের আঘাতে জখম হবামাত্র পালাবার তালে থাকে। মোরগ সেক্ষেত্রে ঘোরতরভাবে জখম হওয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত লড়ে যায়। লড়তে লড়তে মরে, তবু সরে না। লড়িয়ে মোরগকে ঠিকমতো তালিম দিয়ে তৈরি করবার যে কায়দা-কৌশল, যেমন লখনউয়ে তেমনি হায়দরাবাদেও গত দুই শতকে তার খুব চর্চা হয়েছিল। দু-জায়গার পদ্ধতি প্রকরণে কোনো পার্থক্য ছিল না তা নয়, তবে আগ্রহ আর উন্মাদনা যে দুটি কেন্দ্রেই একেবারে তুঙ্গে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

রণক্ষেত্রে কারও মোরগ হেরে গেলে তিনি সেটাকে তাঁর নিজেরই পরাজয় বলে গণ্য করতেন। শররের বৃত্তান্তে এইরকমের এক মোরগবাজের গল্প আছে। তাঁর তালিম দেওয়া মোরগ একবার আর-একজনের মোরগের কাছে হেরে যাওয়ায় লজ্জায় ও মনঃকষ্টে তিনি ইরাকে চলে যান। কিন্তু দেশান্তরী হয়েও তিনি সেই পরাজয়ের বেদনা ভুলতে পারেননি; ঈশ্বরের কাছে দিবারাত্রি প্রার্থনা করতে থাকেন যে, তাঁকে যেন এমন একটি মোরগ পাইয়ে দেওয়া হয়, যে কখনও কারও কাছে হারবে না। শেষপর্যন্ত এক জঙ্গলে সেই মোরগের সন্ধান মেলে, আর মেলামাত্র সেটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি লখনউয়ে ফিরে আসেন। অতঃপর

আর কখনও তাঁকে যে—অন্তত মোরগবাজির ব্যাপারে—কারও কাছে অপদস্থ হতে হয়নি, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

লখনউ শহরে মোরগ-লড়াইয়ের সূচনা নাকি শুজাউদ্দৌলার সময়ে। তবে তাঁর সঙ্গে তাঁর পরবর্তী নবাবদের পার্থক্য এইখানে যে, শুজাউদ্দৌলা নিজেও ছিলেন লড়ুয়ে মানুষ, আর পরবর্তী নবাবরা সেক্ষেত্রে নিজেরা কখনও যুদ্ধবিগ্রহ না করে শুধু পশুপাখির লড়াই দেখেই জীবন কাটিয়েছেন। মোরগবাজির নেশা ছিল ওয়াজিদ আলি শাহেরও। বস্তুত একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল। নইলে নিশ্চয় তাঁর সৌভাগ্যসূর্য যখন একেবারে পুরোপুরি অস্তমিত, এবং ইংরেজদের কৃপার উপরে ষোলোআনা নির্ভর করে যখন মেটেবুরুজে তাঁর দিন কাটছে, তখন সেখানে আবার নতুন করে তিনি মোরগ-লড়াইয়ের আসর বিছিয়ে বসতেন না। লখনউয়ে সেই আসর যে আরও অনেক বড়ো ছিল, সে-কথা আমরা ধরেই নিতে পারি। শুধু নবাব আর কিছু সম্পন্ন ব্যক্তি কেন, সেখানকার সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যেই মোরগবাজির নেশাটা বেশ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল। প্রেম চন্দও তাঁর গল্পে সে-কথার উল্লেখ করতে ভোলেননি।

ওয়াজিদ আলি শাহের লখনউয়ের চিত্র রচনা করতে গিয়ে সত্যজিৎ সে-কথা মনে রেখেছেন বইকি। চিত্রটি যাতে সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়, এবং—একই সঙ্গে—লখনউয়ের প্রমোদপরায়ণতার দিকটাও যাতে সর্বাঙ্গীনভাবে ধরা দেয়, তার জন্য মোরগ তো বটেই, ভেড়ার লড়াইয়েরও ব্যবস্থা তাঁকে করতে হয়েছে। উপরন্তু আছে ঘুড়ির লড়াই। পতঙ্গবাজি। লখনউয়ের আকাশকে রঙে রঙে রঙিন করে দিয়ে তখন অসংখ্য রকমের ঘুড়ি উড়ত। তার সঙ্গে উড়ত টাকা। ঘুড়ি উড়িয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, লখনউয়ে আজও এমন বিস্তর পতঙ্গবাজের গল্প শোনা যায়।

আজকে শুধুই মোরগের লড়াইয়ের ছবি তোলা হল। দেখলুম, উত্তেজিত জনতার চিৎকার কীভাবে মোরগ দুটিকে খেপিয়ে তুলেছে। কীভাবে তারা পরস্পরের উপরে ঝাঁপিয়ে



পড়ে চক্ষু আর নখর দিয়ে মুহুর্মুহু আঘাত হেনে যাচ্ছে। চোখের মণি ভাটার মতো ঘুরছে। রক্ত ঝরছে; পালক উড়ছে; মনে হচ্ছে, অন্তত একটি মোরগের মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত এ লড়াই থামবে না। তার আগেই অবশ্য যুদ্ধমান মোরগ দুটিকে সরিয়ে নেওয়া হল।

ঝটাপট... ঝটাপট... ঝটাপট! লড়াই শেষ। এখন আলাদা করে চলছে তাদের ডানা ঝাপটানির সাউন্ড টেকিং। সত্যজিৎ চুপচাপ সব দেখে যাচ্ছেন। শব্দগ্রহণ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন, প্যাক আপ।

সবাই হোটেলে ফিরে যায়। শুধু আমি, রঘুবীর সিং ও কামু মুখুজ্যে সেখানে থেকে যাই। ভুলভুলাইয়া না দেখে আমরা ফিরছি না।

৯

বড়ো ইমামবড়া বা মচ্ছিভবন বলতে যে অট্টালিকা সমষ্টিকে বোঝায়, তারই প্রধান হর্ম্যের মধ্যে ভুলভুলাইয়া আসলে মস্ত একটি গোলকধাঁধাই। অলিন্দের পর অলিন্দ, প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ, সোপানের পর সোপান, গলিপথের পর গলিপথ। হঠাৎ দেখলে এই বিন্যাসকে নিতান্ত নিরীহ বলে মনে হয়; কিন্তু খানিক বাদেই বিভ্রমের সৃষ্টি হতে থাকে। আসলে এই অসংখ্য অলিন্দ, কুলুঙ্গি, প্রকোষ্ঠ, গবাক্ষ, সোপান আর গলিপথের নকশার মধ্যে এমন একটি নিখুঁত সামঞ্জস্য রয়েছে যে, সেটাই সকলের ভ্রান্তি জাগায়; একটি পথের থেকে অন্যটিকে আলাদা করে চেনা যায় না; বাইরের পথ খুঁজে নিতে গিয়ে বারবার সেই একই নকশার মধ্যে ঘুরে মরতে হয়। লখনউ ভ্রমণের শেষে কলকাতায় ফিরে এক বন্ধু বলেছিলেন, ভুলভুলাইয়ার ছকটিকে একেবারে আদ্যন্ত মুখস্থ করে না নিয়ে যদি কেউ সেই জটিলতার মধ্যে একবার ঢুকে পড়েন, তো গাইডের সাহায্য ছাড়া তিনি বেরিয়ে আসতে পারবেন না। বন্ধুটি যে আদৌ বাড়িয়ে বলেননি, খানিক ঘুরেই সেকথা আমাদের মালুম হয়ে যায়। 'বাদশাহী আংটি'-র কথা মনে পড়ে। সত্যজিতের সেই বইয়ের মধ্যে এক গোঁয়ারগোবিন্দ গোরা-পল্টনের গল্প আছে। বাজি ধরে সে নাকি ভুলভুলাইয়ার মধ্যে ঢুকেছিল, কিন্তু প্রাণ নিয়ে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি, দিন দুয়েক বাদে এই গোলকধাঁধার এক গলির মধ্যে তার মৃতদেহটিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ভুলভুলাইয়ায় ঢুকবার আগে মনে হয়েছিল, এটা নেহাত গল্পই। তাই নিতান্ত এই অট্টালিকার ধাঁধাটিকে দেখিয়ে দেবার দক্ষিণা বাবদ গাইড যখন আমাদের কাছে পুরো পাঁচটি টাকা দাবি করে, তখন আমরা রাজি হইনি। বলেছিলুম, তিন টাকার বেশি দেব না। গাইড অতিশয় চালাক ছেলে। একগাল হেসে বলেছিল, ‘‘বেশ তো, আগে ভিতরে গিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝুন, তারপর যা ইচ্ছে হয় দেবেন।’’ পরে সে যখন সেই জটিল জালের মধ্যে আমাদের মিনিট দশেক ঘুরিয়ে নিয়ে চকিতে একবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তখন নিজেদের উপরে নির্ভর করে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার গলদঘর্ম চেষ্টা চালিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে-কাজটা আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের অবস্থা তখন ‘গুপ্তধন’ গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের মতো। মৃত্যুঞ্জয় তবু যা হোক চিৎকার করে সন্ন্যাসীর সাড়া পেয়েছিল। আমরা যদি নিরুদ্দিষ্ট গাইডের সাড়া না পাই? তাহলে তো সেই গোরা-পল্টনের দশাই প্রাপ্ত হতে হবে। ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে যায়। রঘুবীর সিং বলেন, ‘‘এ তো বড়ো তাজ্জব ব্যাপার! লোকটা গেল কোথায়?’’ কামু মুখুজ্যে বলেন, ‘‘একেবারে ভ্যানিশ করে গেল যে!’’ কেশে-টেসে গলা সাফ করে নিয়ে আমি চেঁচাই, ‘‘ওরে ভাই, পাঁচটা টাকাই দেব!’’ তাতে একেবারে মন্ত্রের মতো কাজ হয়। আড়াল থেকে চকিতে আবার সামনে এসে আমাদের গাইড বলে, ‘টাকাটা কিছু নয়, কিন্তু দেখলেন তো।’’

উদ্ধার পাবার পরে আতঙ্ক কেটে যায়। তখন সেই সুবিপুল নির্মিতির সৌন্দর্য ও মহিমা, তার দরবার কক্ষের আড়ম্বর এবং তার ‘‘খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা’’ ও রহস্যের আর-একটু নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করি। ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়ের কথা আবার নতুন করে মনে পড়ে। অনিবার্যভাবে মনে হতে থাকে সেই দিনগুলির কথা, এই প্রকোষ্ঠগুলি যখন শূন্য ছিল না, এই অলিন্দ ও গলিপথ যখন সুগন্ধি নির্যাসে আমোদিত হয়ে থাকত, এই কুলুঙ্গিগুলিতে যখন সারি-সারি আলো জ্বলত এবং দিবস যখন উন্মাদনায় পরিপূর্ণ ছিল আর রাতগুলি ছিল রোমাঞ্চময়।

সেই সৌরভ, সেই আলো, সেই উন্মাদনা ও সেই রোমাঞ্চের কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। মেঝের পাথর লোপাট হয়ে গেছে, পুরোনো সুরকির ধুলো উড়ছে চতুর্দিকে, এখানে-ওখানে ফাটল ধরেছে, ছাত ও দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে পলেস্তারা। নবাবরা যেখানে বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন, সেই ভুলভুলাইয়া এখন চৌপর শুধু টুরিস্ট টানে। সংকীর্ণ, সুদীর্ঘ গলিপথের একপ্রান্তে তাঁদের দাঁড় করিয়ে রেখে গাইড চটপট অন্যপ্রান্তে চলে যায়। যাবার আগে বলে যায়, ''দেওয়ালে কান পাতুন। আমি যদি ওদিক থেকে ফিসফিস করেও কথা বলি, তো এখান থেকে তাও আপনারা স্পষ্ট শুনতে পাবেন।''

সকলে যেমন দেওয়ালে কান পাতে, তেমনি আমরাও পাতি। সকলে যেমন সেই ফিসফিস কথা শুনতে পায়, তেমনি আমরাও পাই। সকলে যেমন খুশি হয়ে বলে 'সাবাশ', তেমনি আমরাও বলি 'সাবাশ'। তারপর বেরিয়ে আসি চত্বরে।

বিশাল চত্বর। তার একদিকে মসজিদ, অন্যদিকে শাহি বৌলি। ভুলভুলাইয়ায় ঢোকার আগে শাহি বৌলি দেখে নিয়েছিলুম। সেখানে যে বাচ্চা ছেলেটি আমাদের গাইড হয়েছিল, তার নাম আইয়ুব। অমন চটপটে চালাক ছেলে খুব কমই দেখা যায়। বাচ্চা বলে একটুও সংকোচ নেই, আইয়ুবের মুখে সদাসর্বদা মস্ত-মস্ত ঐতিহাসিক নাম আর সন-তারিখের খই ফুটছে। কেউ যখন কথা বলে, তখন সাধারণত তার ওষ্ঠ ছাড়া আর কিছুই নড়ে না। কিন্তু তর্জনী উঁচিয়ে আইয়ুব যখন কথা বলে, তখন তার গোটা মুখমণ্ডল নড়তে থাকে। এমনকি, তার ভুরু দুটিও তখন ধনুকের মতো বেঁকে যায়। আদৌ কোনো ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করেও যে এমন গড়গড় করে ইংরেজি বলা যায়, বছর বারো বয়সের এই মিনি-গাইডকে না দেখলে তা আমি বিশ্বাসই করতুম না।

শাহি বৌলি আসলে মস্ত একটি কুয়ো। বড়ো ইমামবড়ার অন্তর্গত বিভিন্ন হর্ম্য নির্মাণের ব্যাপারে যাতে জলের অভাব না ঘটে, তার জন্য নবাব আসফউদ্দৌলার সময়ে এটি কাটানো হয়েছিল। এই কুয়োর সঙ্গে তলে তলে নাকি গোমতী নদীর যোগ রয়েছে, সেই কারণে এর

জল কখনও শুকোয় না। আইয়ুব এইসব জরুরি খবর অত্যন্ত দ্রুত আমাদের জানিয়ে দিয়ে তারপর বলে, ''ওয়ান ওয়েল, বিল্ডিং কমপ্লিট!''

ইমামবড়া থেকে বেরিয়ে আমরা চৌক-এলাকায় যাই। গিয়ে দেখি, সেখানকার দোকানপাট সব বন্ধ। কেন? না আজ বিষ্যুৎবার। বিষ্যুৎবারে নাকি এই এলাকার একটা দোকানও খোলা থাকে না। খিদে পেয়েছে। ভেবেছিলুম, পুরি-কচুরির দোকানে বসে পেট পুরে খাওয়া যাবে। কিন্তু তার উপায় নেই। অগত্যা এক ভ্রাম্যমাণ ফলওয়ালার কাছ থেকে কিছু কলা আর কমলালেবু কিনি। তারপর সাইকেল-রিকশায় উঠে বসি।

তক্ষুনি অবশ্য হোটেলে ফিরি না। পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। তারপর রাতের খাওয়া সেরে নেবার জন্যে যাই লালবাগে। খাওয়াদাওয়ার পরে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে রঘুবীর বলেন, ''গজক কিনতে হবে। মি. রায়ের ঘরে সেদিন খেলুম। দারুণ জিনিস। আবার খাব।'' গজক হচ্ছে একরকমের শুকনো মিষ্টি। গুড় আর চিনি, দুয়ের থেকেই তৈরি হতে পারে। যেমন ফুরফুরে হালকা, তেমনি মোলায়েম। মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। রাস্তার এক ফিরিওয়ালার কাছ থেকে গজক কিনি। তারপর গজক খেতে-খেতে ঢুকি কফির দোকানে। গরম-গরম দু-কাপ কফি খাই। সাড়ে আটটা বাজে। এবারে হোটেলে ফিরতে হবে। ভেবেছিলুম, সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার লখনউ সম্পর্কে সত্যজিতের সঙ্গে দু-একটা কথা বলব। কিন্তু তার সুযোগ হয় না। হোটেলে ফিরে শুনলুম, তিনি একটা ফিল্ম দেখতে বেরিয়ে গেছেন।

২৮ জানুয়ারি। যেখান থেকে শুরু করেছিলুম, আবার সেইখানে ফিরে এসেছি। দেওরাইকালান। বড়ো সুন্দর এই গ্রাম চারদিকে চোখ বুলিয়ে মনে হয় শুধু সুন্দর নয়, সচ্ছলও। তার মানে এই নয় যে, বিস্তর দালানকোঠা আমার চোখে পড়ছে। না, তা নয়। সত্যি বলতে কী, ইটের তৈরি বাড়ি, অন্তত এখনও পর্যন্ত একটিও এখানে দেখিনি। কাঁচা বাড়ি, মাটির দেওয়াল। তবু, সচ্ছলতার এমন কিছু চিহ্ন চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে যা চোখে পড়ে না। দেওরাইকালানের

এক চাষি গৃহস্থের বাড়ির বহিরঙ্গনে আমরা জমায়েত হয়েছি। বাড়িটি এই গ্রামের একেবারে প্রান্তে। বাইরের উঠোন যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই মাঠের শুরু। মাঠ একেবারে সবুজ হয়ে আছে। অধিকাংশই গম কিংবা চানার খেত। মাঝেমধ্যে সর্ষে বোনা হয়েছে। সেখানে একটু হলুদের ছোপ দেখা যায়।

আজ খুব ভোরে উঠতে হয়নি। সকাল আটটায় হোটেল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি। বানা-মানপুরের সেই চেনা পথ। কিন্তু বানা-মানপুরে আমরা থামি না। ইউনিটের বাস আরও মাইলখানেক এগিয়ে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে দেওরাইকালানের ঠিক বাইরে এসে থামে। বাস থেকে নেমেই একটা ধাক্কা খাই। নৈঃশব্দ্যের ধাক্কা। বুঝতে পারি, মস্ত এক স্তব্ধতার রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। এমন স্তব্ধতা, যাকে বৃক্ষের মর্মর, বাঁশঝাড়ের মটমট ও নিঃসঙ্গ একটি ঘুঘুর ডাক আরও স্পষ্ট ও প্রকট করে তুলেছে। আমাদের সামনেই একটি দিঘি। দিঘির পাড়ে আম্রকুঞ্জ। তার মধ্যে রোদ্দুর আর ছায়ার আল্পনা। পশ্চিম থেকে হু-হু করে বাতাস বইছে। বাতাসের সঙ্গে উড়ছে শুকনো পাতা, খড়কুটো আর ধুলো। মোষের পিঠে কালো টিংটিঙে একটা ছেলে। ছেলেটা খুব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকায়। তার নিষ্পাপ ও সরল চাউনি দেখে আমার মনে হতে থাকে যে, শুধু শহরই পালটে যায়, গ্রাম আর পালটায় না। নবাবি আমলের পরে লখনউ অনেক পালটে গেছে, কিন্তু লখনউয়ের আশপাশের গ্রাম এখনও পালটায়নি। একশো-দেড়শো বছর আগেও এই গ্রামের চেহারা নিশ্চয় এইরকমই ছিল।

সেটা যে খুব ভুল ধারণা, একটু বাদেই তা বুঝতে পারি। গ্রামে ঢুকেই একটা ঝাড়াই মেশিন দেখতে পাই। মাটির দেওয়ালে লাল ত্রিকোণ। তার থেকে খানিকটা দূরে—আর একটা মাটির বাড়ির দেওয়ালে—আলকাতরা দিয়ে মস্ত করে লেখা, 'শ্রমদান মহাদান'। চোঙা প্যান্ট পরা একটি ছেলে ক্রিংক্রিং করে তার সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। এইবারে নিশ্চয় বিশ কিংবা পঁচিশ দফা কর্মসূচির

প্রশস্তি চোখে পড়বে। তা অবশ্য পড়েনি। তবু যেটুকু চোখে পড়ে, তাতেই ঠাহর করতে পারি যে, গ্রামও অনেক পালটেছে।

মাঠ থেকে গ্রাম সাধারণত একটু উঁচু হয়। এখানে মাঠ আর গ্রামের উচ্চতা মোটামুটি একই। তার মানে এখানে জল দাঁড়ায় না। শুকনো খটখটে জায়গা, চার-পাঁচখানা করে খোড়ো চালের ঘর নিয়ে এক-একটা বাড়ি। প্রতিটি বাড়ি ঘিরে দু-মানুষ উঁচু দুর্ভেদ্য মাটির দেওয়াল। দেওয়ালের মাঝামাঝি একটি দরজা। অন্দর আর সদরের যোগসূত্র। এইরকম একটি বাড়ির বাইরের উঠোনে এসে আমরা জমায়েত হই। গৃহকর্তা চটপট কয়েকটি খাটিয়া এনে দেন। মস্ত উঠোন। এতই পরিচ্ছন্ন যে, মনে হয়, এইমাত্র কেউ খুব যত্ন করে ঝাঁটপাট দিয়েছে। আসলে এ হল পছিয়া বাতাসের কাজ। এত জোরে বাতাস বইছে যে, কুটোটি পর্যন্ত পড়ে থাকতে পারছে না।

উঠোনের মাঝখানে শতরঞ্জি বিছিয়ে দেওয়া হয়। দুই দাবাড়ু সেখানে মুখোমুখি বসে পড়েন। বই দেখে সত্যজিৎ তাঁদের দাবার ছকটি সাজিয়ে দেন। তারপর চারদিকে একবার চক্কর দিয়ে স্ক্রিপ্ট হাতে ফের তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। আসতে-আসতে থমকে দাঁড়ান। সন্দিগ্ধভাবে একবার উঠোনের উপরে চোখ বুলিয়ে নেন। বলেন, "বড্ড বেশি পরিষ্কার উঠোন, এতে চলবে না। একটু নোংরা হলে ভালো হত।" ভালো হত মানে স্বাভাবিক হত। তৎক্ষণাৎ কিছু খড়কুটো আর শুকনো-পাতা এনে ইতস্তত ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তকতকে উঠোনটি আবার ময়লা হয়ে যায়। সত্যজিতের মুখে হাসি ফোটে।

খুবই ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু এই ছোট্ট ঘটনাই মানুষটিকে আরও স্পষ্ট করে চিনিয়ে দেয়। সত্যজিৎকে এখানে, একই সঙ্গে, শিল্পী ও সমালোচকের ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি। তাঁর শিল্প সাধারণত বাস্তবকে অতিক্রম কিংবা অস্বীকার করে না, যতটা সম্ভব বাস্তবের কাছাকাছি থাকতে চায়। কিন্তু সমালোচক হিসেবে তিনি এখানে থমকে দাঁড়িয়েছেন। তার কারণ, তিনি খুব ভালোই জানেন যে, বাস্তবের সত্য আর শিল্পের সত্য হুবহু একই বস্তু নাও হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। তিনি আরও জানেন, বাস্তব সত্য যখন 'অবাস্তব' বা অবিশ্বাস্য

একটা চেহারা নেয় (তাও নেয় নিশ্চয়ই; নইলে কি আর 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশন'—এই কথাটা এত সহজে গ্রাহ্য হত?), শিল্পে সে তখন পরিত্যাজ্য। অন্তত সেই শিল্পে, যা কিনা বাস্তবের কাছাকাছি থাকতে চাইছে। বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হিসেবে তাঁর শিল্পকে ষোলোআনা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্যেই শিল্পীকে তখন বাস্তব থেকে কিছুটা সরে যেতে হয়, সরে গিয়ে আবার নতুন করে বানিয়ে তুলতে হয় তাঁর শিল্পের সত্যকে। যাঁরা মনে করেন যে, শুধু মিথ্যেটাই বানিয়ে তুলবার ব্যাপার, সত্যটা নয়, তাঁরা আসলে শিল্পের সত্যের ব্যাপারটা ঠিক বোঝেন না। বাস্তবসত্য বিশ্বাসযোগ্যতার ধার ধারে না, শিল্পের সত্যের পক্ষে সেক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য হওয়াই চাই। শুধু বাস্তব হওয়াটাই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, বাস্তব বলে গ্রাহ্য হওয়াটাই আসল কথা।

তকতকে উঠোনের উপরে খড়কুটো আর শুকনো পাতা ছড়িয়ে দেবার ফলে আরও একটা সুবিধে এই হয় যে, আলোটা ভেঙে যায়; আলো ও ছায়ায় তৈরি হয়ে ওঠে সুন্দর একটা সামঞ্জস্য।

পাছে এসে ক্যামেরার চোখের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাই খাটিয়াগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অগত্যা একটা বুড়োনিমের শেকড়ের উপরে বসে চটপট সব লিখতে থাকি। কিন্তু সেখান থেকেও সরে আসতে হয়। খাতা বন্ধ করে একপাশে গিয়ে দাঁড়াই। এখন কিছু লেখা যাবে না। পরে লিখব। এখন শুধু দেখে যাওয়ার পালা।

উঠোনটা ফাঁকা নয়। এখানে-ওখানে মস্ত কয়েকটা গাছ। আম, নিম, কুল, যজ্ঞিডুমুর। একদিকে একটা হৃষ্টপুষ্ট গোরু মাটির গামলায় মুখ ডুবিয়ে জাবনা খেয়ে যাচ্ছে। শুকনো পাতার আঁটিগুলো মাটির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে একটা গোরুর গাড়ির চাকা। উঠোনের একপ্রান্তে, ডাঁই করা খড়ের পাশে, ঘুঁটে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। নিমগাছটা এমনভাবে মাটির উপরে মস্ত-মস্ত শিকড় ছড়িয়েছে যে, হঠাৎ দেখলে বিশাল একটা শকুনের ঠ্যাং বলে মনে হয়। বাঁধানো ইঁদারা। হালের বলদ। ঝাড়াই মেশিন। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার ঠিক পিছনেই একটা শুকনো খটখটে ডোবা। এটা যে কেউ যত্ন

করে কাটিয়েছিল, এমন মনে হয় না। বরং ধারণা হয় যে, ভূমিকম্পে মাটি ধসে গিয়ে একটা বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

বেলা বাড়ছে। ভিড় বাড়ছে। গ্রামের লোকজন তো আছেই, শহর থেকে যারা ছুটে আসছে, তাদের সংখ্যাও কম হবে না। লখনউ এখান থেকে দূর নেহাত কম নয়, অথচ সেখান থেকেও লোক আসার কামাই নেই। বানা-মানপুরেও শহুরে লোকের ভিড় দেখেছিলুম; কিন্তু সেই ভিড় যে হাইওয়ে থেকে এতটা দূরবর্তী এই গ্রামেও এসে পৌঁছবে, তা ভাবিনি। উঠোনটা দেখতে-দেখতে ভরে যায়। উঠোন ছাপিয়ে ভিড় গিয়ে মাঠের মধ্যে নামে, খানিকবাদেই জায়গাটা একটা মেলার মতো চেহারা নেয়।

তারই মধ্যে কাজ করে যাচ্ছেন সত্যজিৎ। কখনও চোখ রাখছেন ক্যামেরায়, কখনও হাতের ইঙ্গিতে কাউকে একটু দূরে সরে যেতে বলছেন। কখনও সঞ্জীবকুমারের গায়ের শালটিকে একটু গুছিয়ে দিচ্ছেন, কখনও সয়িদকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ কথাটায় ঠিক কতটা জোর দেওয়া দরকার। স্ক্রিপ্ট হাতে নিয়ে জাভেদ সিদ্দিকি একেবারে ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছেন। আজই সকালে জাভেদ বলছিলেন যে, সত্যজিতের সঙ্গে কাজ করার এই যে সুযোগ তিনি পেয়েছেন, এটা তাঁর জীবনে একটা মস্ত বড়ো ঘটনা। "একই সঙ্গে এত মগ্ন অথচ পরিশ্রমী মানুষ এর আগে আর কখনও আমি দেখিনি। এত সহানুভূতিশীল মানুষও না।"

একটু আগেই কলকাতা থেকে লখনউয়ে এসে পৌঁছেছেন অ্যাসিসট্যান্ট পুলিশ কমিশনার শ্রীসমীরকুমার সরকার। লখনউ থেকে সরাসরি তাঁকে দেওরাইকালানে নিয়ে আসা হয়। তাঁর হাতে কারুকার্যকরা দুটি পিস্তল। ঠিক এই ধরনের শৌখিন পিস্তল এখন জাদুঘর ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যাবে না। তিনি বলছিলেন যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই পিস্তল ব্যবহার করা হত। "দে অলওয়েজ কেম ইন পেয়ার্স।" যাদের বলছিলেন, তারা তখনও জানত না যে, এই পিস্তল আজও অকেজো হয়ে যায়নি।

শ্রীসরকারের কথা শুনতে-শুনতে আমি সত্যজিতের দিকে তাকাই। সৌম্যেন্দু রায়ের সঙ্গে জরুরি দু-একটা কথা বলে নিয়ে এইমাত্র তিনি আবার ক্যামেরার পিছনে গিয়ে বসলেন।

"সাইলেনস!"

জনতা স্তব্ধ হয়ে যায়।

'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র শুটিং চলছে।

১০

একজন শিল্পী তাঁর কাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে আছেন, এবং অজস্র রকমের উপকরণের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একটু-একটু করে তৈরি করে তুলছেন তাঁর শিল্পকর্ম, চোখের সামনে এই ব্যাপারটাকে—কিংবা আরও বিশদ করে বলা যায়, সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে—দেখতে পাওয়া যে একটা মস্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণত শুধু সেই জিনিসটিই আমরা দেখি, যার নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গেছে। ঠিক কীভাবে সেটি নির্মিত হল, তার খবর আমরা রাখি না। বুঝতে পারি না, ঝলমলে যে প্রতিমাটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, খড় ন্যাকড়া মাটি আর সামান্য কিছু রঙের ভিতর থেকে ঠিক কীভাবে একজন শিল্পী তাকে নিষ্কাশন করে এনেছিলেন। খড়-মাটিও মৌল ব্যাপার নয়, তারও পিছনে রয়েছে ভাবনা, সামান্য খড়-মাটির ভিতর দিয়ে যা কিনা মুক্তি পেতে, মূর্ত হয়ে উঠতে চাইছে।

ভাবনা কীভাবে মুক্তি পায়? রূপের মধ্যে কীভাবে সে মূর্ত হয়ে ওঠে? এটা কি একটা আকস্মিক ঘটনা? তা নিশ্চয় নয়। বরং এই রকমের একটা সিদ্ধান্ত করতেই আমাদের ভালো লাগে যে, রূপ নিতান্ত বাইরের জিনিস নয়, শিল্পীর ভাবনার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে রূপের ওই ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্যকে তিনি বাইরে টেনে আনেন, এবং আমাদের চোখের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দেন।

কলকাতায় যখন সত্যজিতের সঙ্গে কথা হয়, তখন অন্তত এমনটাই আমার মনে হয়েছিল। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র শুটিং শুরু হওয়া তো দূরের কথা স্ক্রিপ্টও তখনও লেখা হয়নি। অথচ তখনই এমন দু-একটি কথা তিনি বলেছিলেন, যার থেকে আমার মনে হয়েছিল যে, রূপৈশ্বর্যময় এক আশ্চর্য জগতের একখানি ছবি যেন তাঁর ভাবনার মধ্যে জন্ম নিয়েছে। টুকরো ছবি নয়, সর্বাঙ্গীন একটি চিত্র। সেই চিত্রখানিকে তার সমস্ত অনুপুঙ্খসহ তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। এখন শুধু তাকে এঁকে ফেলবার, অর্থাৎ সর্বজনের চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবার কাজটাই বাকি।

স্ক্রিপ্ট, কাস্টিং, শুটিং ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই সত্যজিতের কাজ যে অত্যন্ত দ্রুত এগোয়, তাঁর এক্সপোজ করা ফিল্মের অত্যন্ত কম অংশই যে এডিটিং-এর সময়ে বরবাদ হয়, এবং প্রাথমিক নানা উপাদান জোগাড় হয়ে যাবার পরে যে আর তাঁর ওয়ার্ক-শিডিউলের কোনো নড়চড় হয় না, সমস্ত কাজ একেবারে ঘড়ি ধরে কাঁটায়-কাঁটায় চলতে থাকে, আমার তো মনে হয়, এটাই তার মস্ত কারণ। এমন নয় যে, যখন কাজ চলছে, তখন কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে তিনি ভোগেন না। সমস্ত সৎ শিল্পীর মতো তাঁকেও যে তখন হরেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়, খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারে সন্দেহে সংশয়ে দুলতে হয় এবং কর্মনিরত অবস্থাতেও ভাবতে হয় ছোটোখাটো নানা পরিবর্তনের কথা, স্ক্রিপ্টের কাটাকুটিগুলিই তো তার প্রমাণ। কিন্তু সেগুলি ডিটেল্‌সের ব্যাপার, মৌলিক কোনো পরিবর্তনের ঘটনা নয়। মূল ছবিটা, আমার মনে হয়, সত্যজিতের চোখের সামনে সর্বদা ভাসতেই থাকে; তিলেকের জন্যেও সেটিকে তিনি আবছা হতে কিংবা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যেতে দেন না।

কীভাবে সেই ছবিটিকে তিনি বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা দেন, অর্থাৎ তাঁর ভাবনায় যার জন্ম, কীভাবে তিনি বাস্তবে ফুটিয়ে তোলেন সেই মানসচিত্রটিকে, সেটাই আমি দেখতে চেয়েছিলুম। সৃষ্টির প্রক্রিয়া যে আমার কাছে একেবারে সর্বৈব অজ্ঞাত একটা ব্যাপার, তা তো নয়। বস্তুত যে যন্ত্রণা, অসন্তোষ, অসহিষ্ণুতা আর নিষ্কৃতি লাভের আনন্দ তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে, অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে, তার সামান্য কিছু পরিচয় রাখি বলেই এই

প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমার এত কৌতূহল, এত আগ্রহ। সত্যজিৎ একজন বড়োমাপের শিল্পী। তিনি যখন তাঁর সৃষ্টির কাজে নিরত রয়েছেন, তখন এই অবস্থাটা তাঁকে কীভাবে নাড়া দেয়, কাছের থেকে তা আমি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলুম। দেখতে চেয়েছিলুম যে, একটা চাপের মধ্যে কীভাবে কাজ করে তাঁর মন। তা নইলে আমার অতিদুর্লভ ছুটির দিনগুলি আমি দিঘায় কিংবা পুরীতে গিয়ে কাটাতুম, লখনউয়ে ছুটে যেতুম না।

খুব বেশি দিন তো থাকতে পারিনি, কিন্তু যে-কটা দিন লখনউয়ে ছিলুম, সকাল থেকে সন্ধে অবধি সেই প্রক্রিয়ার খুব কাছাকাছি থাকবার সুযোগ আমি পেয়েছিলুম। তখন দেখেছি একজন শিল্পী তাঁর স্বপ্নকে, তাঁর ভবনাকে কীভাবে বাস্তব রূপ দেন। রূপ দেওয়া মানে অবয়ব দেওয়া। অবয়বের জন্য চাই খড়-মাটি। অর্থাৎ উপকরণ। দেখেছি, কত যত্নে সেই উপকরণ তিনি সংগ্রহ করেন; দেখেছি, কীভাবে একজন শিল্পী তাঁর কাজের মধ্যে নিবিষ্ট, নিমজ্জিত হয়ে থাকেন, এবং অসংখ্য দৃশ্যে বিভক্ত, বিন্যস্ত সেই কাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে কীভাবে তিনি তাকে একটু একটু করে সর্বাঙ্গীন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর সন্তোষ ও সংশয়, তাঁর পরিশ্রম ও প্রশান্তি, তাঁর অভিনিবেশ ও অসহিষ্ণুতা, সমস্ত দিকেই আমি লক্ষ রেখেছিলুম। নইলে নিশ্চয় দেখতে পেতুম না যে, একটি দৃশ্যকে তিনি যেমন করে ধরতে চান, ঠিক তেমন করে ধরতে না পারা পর্যন্ত তাঁর ওষ্ঠ কীভাবে বিরক্তিতে বেঁকে থাকে; আবার আলো ও ছায়ার সঠিক অনুপাত থেকে সঞ্জাত সামঞ্জস্যের মধ্যে কোনো দৃশ্যকে বন্দি করতে পারার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিতে কীভাবে তৃপ্তি ছড়িয়ে যায়।

লখনউয়ে এই সবই আমি দেখেছি। সেইসঙ্গে উত্তর পেয়েছি একটা জরুরি প্রশ্নের। রবীন্দ্রনাথের একটি গান কিংবা নন্দলালের একটি ছবিকে যে অর্থে আমরা সৃষ্টি বলি, চলচ্চিত্রকে ঠিক সেই অর্থে সৃষ্টি বলে গণ্য করা চলে কি না, এই প্রশ্ন আর কখনও আমাকে পীড়িত করবে না। এতদিন যে এই প্রশ্ন আমাকে পীড়িত করত, তার কারণ, শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারটাকে আমি একক-মানুষের আনন্দ-বেদনার ব্যাপার বলে জানি, এবং চলচ্চিত্রকে—

যার মধ্যে অংসখ্য কর্মীর অসংখ্য রকমের ভূমিকা রয়েছে—কখনও তেমন কোনো আনন্দ-বেদনা অথবা মুক্তিবাসনা থেকে সঞ্জাত শিল্প বলে আমার মনে হয়নি। সেক্ষেত্রে লখনউয়ের কয়েকটি দিন যদি আমাকে একটিমাত্র শিক্ষাও দিয়ে থাকে, তবে সেটা এই যে, চলচ্চিত্রকেও—অন্তত কখনো-কখনো—ঠিক সেই অর্থেই আমরা সৃষ্টি বলে গ্রহণ করতে বাধ্য, আলাউদ্দিনের আলাপন কিংবা দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্যকে যে অর্থে আমরা সৃষ্টি বলে গ্রহণ করে থাকি। তারও জন্মরহস্যকে—ক্ষেত্রবিশেষে—একক মানুষেরই সৃজন, স্পৃহার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা যায়। সেখানে আমাদের চোখের সামনে আমরা অনেক কর্মীর অনেক ভূমিকা দেখি ঠিকই, কিন্তু মূলে হয়তো এক্ষত্রেও সেই একক মানুষ গোটা ব্যাপারটাকে একমাত্র যিনিই কিনা সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতার মধ্যে চাক্ষুষ করতে পারছেন। অন্যেরা তাঁর ব্যবহার্য উপাদান মাত্র। যেমন আলো আর ছায়া; কিংবা সংলাপ আর সুর, কিংবা হরেকরকমের সাজ-সরঞ্জাম আর আসবাবপত্র, তেমনি কিছু মানুষকেও তিনি হয়তো তাঁর শিল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে যাচ্ছেন, এবং সেই অজস্র উপাদানের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বানিয়ে তুলছেন তাঁর সৃষ্টিকে। সেই সৃষ্টিকে, যা তাঁর ভাবনার মধ্যে লুকিয়েছিল, এবং একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউই যাকে দেখতে পাচ্ছিল না।

'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র খানিকটা তৈরি হয়েছে লখনউয়ে (আর জয়পুরে), বাকিটা কলকাতায়। আমার পরিচয় কলকাতার স্টুডিয়োতে গৃহীত দৃশ্যাবলির সঙ্গে ততটা নয়, যতটা লখনউয়ের মুক্ত পরিবেশে গৃহীত দৃশ্যাবলির সঙ্গে। কিন্তু প্রেম চন্দের গল্প ও সত্যজিতের স্ক্রিপ্‌ট পড়ে এবং সত্যজিৎ তাঁর এই ছবিকে যেভাবে যেদিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, চোখের সামনে তার সবটা না হোক, খানিকটা অংশ দেখতে পেয়ে আমার যা ধারণা হয়েছে, সেটা এই যে, যে কাহিনির ভিত্তিতে সত্যজিৎ তাঁর এই চলচ্ছবিকে গড়ে তুলছেন, তার স্থান যদিও নবাবি লখনউ, কাল যদিও ঊনবিংশ শতাব্দী, এবং তার পাত্র-পাত্রীদের বেশিরভাগেরই ধমনিতে যদিও নীল রক্তধারা প্রবহমান, তবু নিতান্ত বিগত যুগের

প্রতিবিম্ব হয়ে এ ছবির কাজ হয়তো ফুরোচ্ছে না। স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি ষোলোআনা বিশ্বস্ত থেকেও সেই গণ্ডিটাকে ডিঙিয়ে এ ছবি এমনভাবে বেরিয়ে আসতে চাইছে যে, বিশ শতকের এই অন্ত্য অধ্যায়ের চিন্তা-ভাবনার উপরেও এর বিলক্ষণ প্রভাব পড়তে পারে।

হোটেলের ঘরে বসে এইসব কথাই আমি ভাবছিলুম। অদ্যই এই হোটেলে আমার শেষ রজনি। কাল খুব ভোরে উঠে এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে। জনাকয় বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন। খুব খানিকটা আড্ডা দিয়ে ঘণ্টাখানেক আগে তাঁরা বিদায় নিয়েছেন। রাত এখন এগারোটা। এবার শুয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু ঘুম আসছে না। কয়েকটা দিন যেন দেখতে দেখতে কেটে গেল। কাজে-আনন্দে-উত্তেজনায় ঠাসা কয়েকটা দিন। সেই দিনগুলির কথা ভাবছি। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে গত শতকের সেই বিলাস-বৈভবের বর্ণচ্ছটা, অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তরশ্মির মতো ভারতবর্ষের আকাশকে যা রাঙিয়ে তুলেছিল, এবং যা আর কখনও ফিরে আসবে না।

ভারতবর্ষের সমস্ত বিলাসের কেন্দ্রে তখন লখনউ আর লখনউয়ের সমস্ত বিলাসের কেন্দ্রে তখন ওয়াজিদ আলি শাহ্। মোমবাতিকে তিনি দুদিকে জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন; ফলে আলোটা অবশ্যই দীর্ঘায়ু হয়নি, কিন্তু দীপ্তি দিয়েছিল দারুণ। তাঁর সম্পর্কে গল্প-কাহিনির আর অন্ত্য নেই। অনেক গল্প আজও লখনউবাসীদের মুখে মুখে ফেরে। আমার সেই অবাঙালি বন্ধুটির মুখেও একটি গল্প শুনলুম। বিশাল একটি মুক্তো কেটে তৈরি করা আতরদান; অসতর্ক দাসীর হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে সেটি ভেঙে যায়। নবাব তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু শব্দটা তাঁর কান এড়ায়নি, চোখ না খুলেই তিনি বলেছিলেন, "ফিন্ বাজাও।" দাসী তো কাঁপতে-কাঁপতে কাঁদতে-কাঁদতে বেগম সাহেবার কাছে ছুটে আসে। বেগম বলেন, "কী ব্যাপার?"

"মুক্তোর আতরদান ভেঙে ফেলেছি।"

"তা নবাব কী বললেন?"

"বললেন, ফিন্ বাজাও।"

শুনে বেগম বললেন, "তবে আর তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? মুক্তোর আতরদান ভেঙে যাবার শব্দটা নিশ্চয় নবাবের কানে খুব মিঠে লেগেছে। যা, ওর জোড়ের এই আতরদানটা নিয়ে যা, নবাবের সামনে গিয়ে এটাকেও ভেঙে দিয়ে আয়।"

হয়তো সত্যি নয়, হয়তো একেবারে গল্পই, তবু সন্দেহ নেই যে, যাঁর সম্পর্কে এমন গল্প রটে, সেই মানুষটি নিতান্ত বিলাসী একজন নবাব ছিলেন না, খাঁটি একজন শিল্পীও ছিলেন।

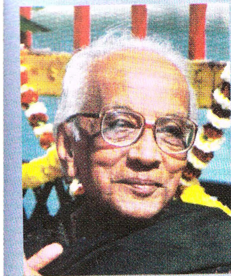
যেমন ভোগবিলাস তেমনি সেই শিল্পীসত্তার দিকেও নজর রেখেছেন সত্যজিৎ (তাঁর সঙ্গে কথা বলে অন্তত সেইরকম আমার মনে হল)। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-তে তাই একদিকে যেমন অনেক বর্ণ, অনেক বাহার, অনেক বিলাস, অনেক বৈভবের উপরে আলো পড়ছে, অন্যদিকে তেমনি সার্বিক পরিচয় ফুটছে সেই মানুষটিরও, ভোগবিলাসের সঙ্গে-সঙ্গে নানাবিধ চারুকলার চর্চাতেও যাঁর উৎসাহের অন্ত্য ছিল না। বস্তুত সেই পরিচয় একদিকে যেমন ওয়াজিদ আলি শাহ্-এর, অন্যদিকে তেমনি সেই সময়কার লখনউয়েরও। কিন্তু শুধু সেই পরিচয়টুকুকে ফুটিয়ে তুলেই যে এই চলচ্ছবির কাজ ফুরোচ্ছে, তাও হয়তো নয়। কাজ হয়তো তার পরেও কিছু-নাকিছু চলতেই থাকবে। কীভাবে চলবে, আগেই আমি তার আভাস দিয়েছি।

২৯ জানুয়ারি। আজ কলকাতায় ফিরব। সাতসকালে প্লেন ধরতে হবে, তাই সূর্য উঠবার অনেক আগেই বিছানা ছেড়ে আমাকে উঠে পড়তে হয়। চটপট দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, স্যুটকেশ গুছিয়ে নীচে নামি।

রাত এখনও কাটেনি। গোটা হোটেল ঘুমিয়ে আছে। কারও সঙ্গে দেখা হয় না।

বিল মেটাবার জন্যে রিসেপশানের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কাউন্টারের ঠিক পিছনেই—গোটা দেওয়াল জুড়ে—বিশাল সেই ছবি টাঙানো। বেগম হজরতমহলের ছবি। আলবোলার শট্কাটিকে ওষ্ঠে রেখে তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিল মিটিয়ে তাঁর চোখে চোখ রাখি। মাথাটাকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বলি, "চলি বেগমসাহেবা।"



নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জন্ম ফরিদপুর, বর্তমান বাংলাদেশ। কবি হিসেবে সুপরিচিত। জীবনানন্দ পরবর্তী চল্লিশ দশকের কবিদের মধ্যে অন্যতম। সাংবাদিকতার পরিচয়ও তাঁকে যশস্বী করেছে। কবিতা বিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধের রচয়িতা। বাংলা ছন্দের প্রকরণ সম্পর্কে, অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ *কবিতার ক্লাশ*। ছন্দ-জ্ঞান ও পরিক্রমায় একটি অপরিহার্য পাঠ্য। নীরেন্দ্রনাথের ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গী শুধু পরিমার্জিতই নয় সুদূরপ্রসারিত। গভীর মনন লেখনীর অন্যতম কারুকাজ। গল্প-উপন্যাস খুব একটা না লিখলেও দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত পিতৃপুরুষ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর প্রধান কবিতার বইগুলি নীল নির্জন (১৯৫৪), অন্ধকার বারান্দা (১৯৬১), নক্ষত্রজয়ের জন্য (১৯৬৯), কলকাতার যীশু (১৯৬৯), উলঙ্গরাজা (১৯৭১) প্রভৃতি। আউটডোর লেখাটিকে একটি চমৎকার রিপোতার্জ বললে ভুল হবে না। তাঁর কবিতার জনপ্রিয়তার কেন্দ্রে রয়েছে প্রকৃতি, প্রেম এবং সমকালিন জীবনের টুকরো ছবি যা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জীবনচেতনার মোড়কে পাঠকের মনে পৌঁছে দেয়।



বর্ণপরিচয়